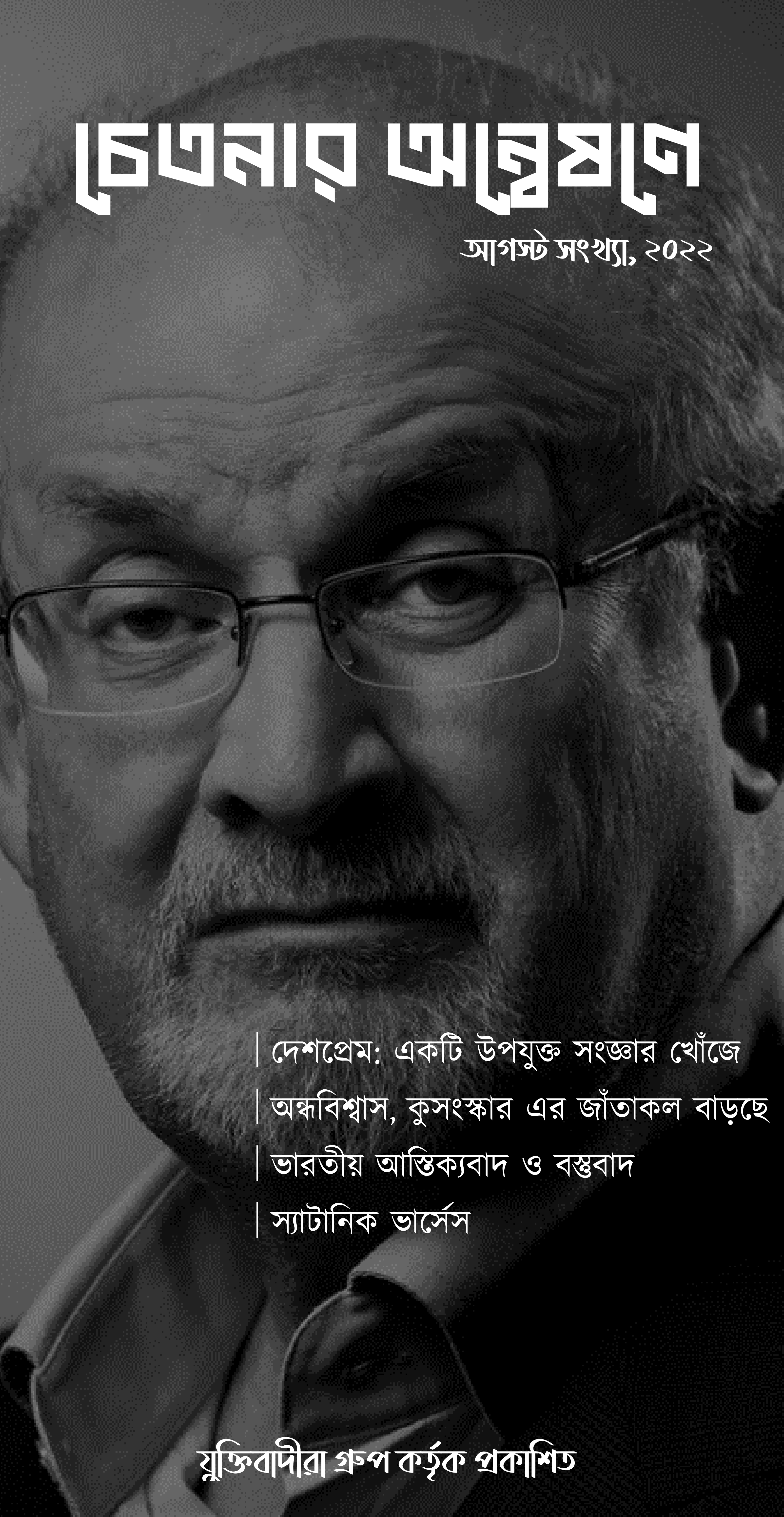


চেতনার অন্বেষণে

আগস্ট সংখ্যা, ২০২২

- দেশপ্রেম: একটি উপযুক্ত সংজ্ঞার খোঁজে
- অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এর জাঁতাকল বাড়ছে
- ভারতীয় আস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদ
- স্যাটানিক ভার্সেস

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

চেতনার অন্বেষণে

| মুক্তচিন্তক মাসিক পত্রিকা
| আগস্ট সংখ্যা, ২০২২

স ম্পা দ ক
যু ক্তি বা দী রা

প্র কা শ সং খ্যা
উ নি শ

স হা য় তা য়
পা র্থ প্র তি ম, দে ব স্মি তা

যো গা যো গ
Email: yuktibadira@gmail.com
WhatsApp: whatsapp click
Telegram: @Yktibadira
Website: rationalists
ক ল কা তা – ৫ ৬

সূ চি

প্র ব ন্ধ -- নি ব ন্ধ

ক বি তা

বি শে ষ সং যো জ ন

| ম্যাগাজিনটি Moon+ Reader বা Adobe Acrobat Reader অ্যাপ দিয়ে পড়ুন ভালো এক্সপেরিয়েন্স পাবেন।

| পত্রিকার গ্রাহক হতে ফর্ম পূরণ করুন- Cilck Here | Scan QR

সম্পাদকীয়

প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে ম্যাগাজিন প্রকাশ করছি। পাঠকদের উদ্দীপনা পাথেয় হয়েছে। আপনারা মাসে মাত্র একটি লেখা লিখুন। যা লিখবেন সংকোচ ছাড়াই পত্রিকায় পাঠান। এটি শুধুমাত্র তাদের জন্য বলছি যারা মনে করেন তিনি একেবারে লিখতে পারেন না এবং সেজন্য চেষ্টাও করেন না। ভাবতে যেহেতু পারেন চেষ্টা করলে লিখতেও পারবেন। লেখার মান নিয়ে একেবারে চিন্তা করবেন না। আপনার ভাবনা প্রকাশ হলেই চলবে। যুক্তিবাদ নিয়ে চর্চা করেন মানেই আপনার মধ্যে প্রগতিশীলতার বাতাস বইছে। এবার শুধু লেখনীর মধ্যে দিয়ে ভাবনা প্রকাশ করে ফেলুন। নিজের নামে না লিখলেও অসুবিধা নেই। জীবনের ব্যস্ততায় নাভিশ্বাস সবাই তারমধ্যেও বাসে, ট্রেনে যেতে যেতে হলেও লিখুন না। আবারও বলছি **গোটা মাসে মাত্র একটা লিখুন**, দেখবেন চেষ্টাটা করলে মাসে ঠিকই একটা লেখা হয়ে যাবে। অনেকে মনে করেন ম্যাগাজিনে দেওয়ার মত করে লেখা হয়নি, সে নিয়েও একেবারে চিন্তা করবেন না। একেবারে না লেখার তুলনায় সামান্য লিখলেও ভালো।

যুক্তিবাদ নিয়ে অনেকেই ভালো লেখেন, নিয়মিত লেখালেখিও করেন। আর একটা কথা, লেখাটি ফেসবুক, ব্লগ বা সোশ্যাল সাইটে প্রকাশ করলেও পত্রিকায় দেওয়া যাবে। এমন কোন ব্যাপার নয় যে কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে দেওয়া যাবে না, ভাবনা তো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই।

মুক্তচিন্তক সলমান রুসদির ওপর হামলা হল। নানারকমভাবেই মুক্তচিন্তকরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। তাই মুক্তচিন্তক, সমাজ হিতৈষী সবারই উচিত কলম তুলে ধরা এবং সমাজকে মৌলবাদের ছায়া থেকে মুক্ত রাখা। এমাসেই ২০ আগস্ট মুক্তচিন্তক নরেন্দ্র দাভেলকার খুন হন, আমরা তাঁকে স্মরণ করছি।

আর একটি আনন্দের কথা, ‘পুঁথি’(puthi) একটি অ্যাপ বেসড বই পড়ার মাধ্যম, তারা পত্রিকাটিকে তাদের প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করতে আগ্রহী, এবার থেকে তাই **পত্রিকাটি ‘পুঁথি’ অ্যাপেও পড়তে পারবেন।**

ধন্যবাদ।

“ধর্ম এবং ধর্মের বইগুলো অলৌকিক নয়, ধর্মের বইগুলো জ্ঞানের বইও নয়; পঞ্চম শ্রেণীর বই পড়লেও যতোটা জ্ঞান হয়, ধর্মের বইগুলো পড়লে ততোটা জ্ঞানও হয় না, বরং অনেক অজ্ঞানতা জন্মে। বিশ্বাস ও অজ্ঞানতা পরস্পরের জননী; জ্ঞান জন্মে অবিশ্বাস থেকে। বিশ্বাসমাত্রই অপবিশ্বাস; জ্ঞান বিশ্বাসের বিষয় নয়, জানার বিষয়। কোনো ধর্মপন্ডিত যদি সারাজীবন ধর্মের বই ও তার ভাষ্য পড়ে, আর কিছু না পড়ে, সে থেকে যায় পঞ্চম শ্রেণীর শিশুটির থেকেও মূর্খ।”

- হুমায়ুন আজাদ

নরেন্দ্র দাভোলকর

-অনিমেষ দত্ত

২০১৩ সালের ২০শে আগস্ট। মহারাষ্ট্রের পুণের বাসিন্দা ৬৭ বছরের এক বৃদ্ধ অভ্যাসমত সেদিনও প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফেরা হয়নি সেদিন তাঁর। মাথায় গুলি করে খুন করা হল তাঁকে। ৬৭ বছরের সেই বৃদ্ধের নাম নরেন্দ্র দাভোলকর। ঘটনার তদন্তভার নেয় সিবিআই। ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর পর ২০১৮ সালে নালাসোপারার একটি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানা থেকে শরদ কলসকরকে গ্রেফতার করে মহারাষ্ট্র সন্ত্রাস দমন শাখা। কলসকরের বয়ানের ভিত্তিতেই খুনের মূল চক্রী বীরেন্দ্র তাউড়েকেও গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতেই খুনের কথা স্বীকার করে লিখিত বয়ান দেয় কলসকর। সেই বয়ানের ভিত্তিতেই কলসকরের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় সিবিআই। ধৃত মূল অভিযুক্ত শরদ কলসকর লিখিত বয়ানে বলেছিল, “খুব কাছ থেকে পর পর দু’বার গুলি চালিয়েছিলাম। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পরই এলাকা ছাড়ি।” এছাড়া কীভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, নেপথ্যে কারা ছিলেন, ঘটনার দিন ঠিক কী ঘটেছিল, ১৪ পাতার স্বীকারোক্তিতে সেই বর্ণনাও দিয়েছিল কলসকর। খুনের মূল চক্রী কারা? সেই বিষয়েও স্পষ্ট বলেছিল কলসকর, “একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্য

বীরেন্দ্র তাউড়ে আমার মগজ ধোলাই করেন। তাঁদের সংগঠনের আদর্শের পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি চলতে থাকে আগ্নেয়াস্ত্র চালানো, বোমা তৈরির প্রশিক্ষণও। তার পর এক দিন বলা হয়, কয়েক জন যুক্তিবাদীকে খুন করতে হবে। সেই তালিকায় আমার দায়িত্ব পড়েছিল দাভোলকরকে খুন করার। আমার উপর নির্দেশ ছিল, মাথায় গুলি করতে হবে, যাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।”

এতক্ষণ যে ঘটনাটার কথা বললাম সেটা কোনো বলিউডের কাঁচা স্ক্রিপ্ট নয়, জলজ্যান্ত একটা খুন! কে এই নরেন্দ্র দাভোলকর? কেন তাঁকে খুন হতে হল? হিন্দুত্ববাদী সংগঠন কেন তাঁকে খুন করল?

১৯৪৫ সালের ১লা নভেম্বর জন্ম হয় নরেন্দ্র দাভোলকরের। বাবা অচ্যুত দাভোলকার। মায়ের নাম তারাবাঈ দাভোলকার। সাত ভাই, তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন নরেন্দ্র। সাতারা শহরের নিউ ইংলিশ স্কুলে পড়েছেন। তারপর তিনি সংলির উইলিংডন কলেজে ভর্তি হন। স্কুল-কলেজের পড়াশোনা শেষ করে নরেন্দ্র সিরাজ মেডিকেল কালেজে ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হন। সবচেয়ে বড়ভাই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজবিদ দেবদত্ত দাভোলকার ছিলেন উইলিংডন কলেজের অধ্যাপক। স্বাধীনতার পর মহারাষ্ট্রের অনেক সামাজিক আন্দোলনে তিনি জড়িত ছিলেন। নরেন্দ্রর জীবনে দাদা দেবদত্তের গভীর প্রভাব ছিল। ডাক্তারিতে এমবিবিএস পাস করার পর তিনি শায়লা

নাম্নী একজন ডাক্তারকে বিয়ে করেন। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে হামিদ। মেয়ে মুক্তা দাভোলকার।

এরপর ডাক্তারি পাস করে ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকর শুধু ডাক্তারিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলেন না। আশির দশক থেকেই তিনি অনুভব করেন, ডাক্তারি ছাড়াও তাঁকে আরো বড় কাজ করতে হবে। দেশকে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই প্রায় ১২ বছর পর একদিন ডাক্তারি ছেড়ে যোগ দিলেন বিজ্ঞান আন্দোলনে। তিনি 'অখিল ভারতীয় অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'-তে যোগ দেন। ১৯৮৯ সালে দাভোলকর 'মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন ও তার সভাপতি হন। মহারাষ্ট্রে তৎকালীন সময়ে বিজ্ঞান আন্দোলনের জোয়ার এতটাই ছিল যে একজন ডাক্তারকে উদ্বুদ্ধ করল সেই লক্ষ্যে পাড়ি দেওয়ায়।

ভারতে বিজ্ঞান আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা আছে। কিন্তু প্রত্যেকটা ধারার মধ্যে কমন নেচার বা লক্ষ্য কিছু থেকে থাকলে সেটা হল বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশের চেষ্টা এবং বিজ্ঞানের প্রযুক্তিকে জনকল্যাণে ব্যবহারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন চালানো। মহারাষ্ট্রও তার ব্যতিক্রম নয়। আশির দশক থেকেই মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠতে লাগলো একাধিক বিজ্ঞান সংগঠন, পত্রিকা গোষ্ঠী। ১৯৮২ সালে লোকবিজ্ঞান সংগঠনের

আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল 'মহারাষ্ট্র বিজ্ঞান যাত্রা'। নাটক, গান, ছবি, মডেল, স্লাইড, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে জণগণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার চলল। ১৯৮৯ সালে সেই ধারাবাহিকতায় কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে তৈরি হল সংগঠন 'অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'। যার মাধ্যমে আসরে এলেন নরেন্দ্র দাভোলকর। এই সমিতি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারে। সেসময় মহারাষ্ট্রে অলৌকিকতার ছড়াছড়ি। অলৌকিক উপায়ে রোগ সারানো, অলৌকিক উপায়ে জীবনে শান্তি ফেরানো ইত্যাদি দাবি নিয়ে একদল ভণ্ড সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে চলেছে। চলছে লাখ লাখ টাকা রোজগার। মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা না করে তাদের 'অশুভ আত্মায় ভর করেছে' এই দাবি দিয়ে চালানো হচ্ছে শারীরিক অত্যাচার। একই সাথে সাপের কামড়ে অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা না করে চলত 'বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পাথর' বিক্রির ব্যবসা। এই সমস্ত অযৌক্তিক অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সোচ্চার হন দাভোলকরেরা। মারাঠী 'সাধন' পত্রিকার মাধ্যমে যুক্তিবাদী বক্তব্য প্রকাশ করা শুরু করেন একই সাথে। অলৌকিক বলে দাবি করা ঘটনাগুলো আসলে যে অলৌকিক নয়, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ শুরু হয় প্রচার। আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বা হৃদযন্ত্র বন্ধ রাখার মধ্যে কোনো অলৌকিকতা নেই, তা হাতে কলমে করে দেখিয়ে মানুষকে

সচেতন করার কাজ চলতে থাকে জোরকদমে। আরও আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দীর্ঘমেয়াদি প্রচার আন্দোলন এর লক্ষ্যে দাভোলকর শুরু করেন 'বিবেক জাগরণ' প্রকল্প। আলোচনা এবং পথনাটক এর মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া যার উদ্দেশ্য। এই কাজে দাভোলকরকে সাহায্য করেন তাঁর বন্ধু নাট্যকর্মী ডাঃ শ্রীরাম।

কুসংস্কার দূরীকরণ এর পাশাপাশি মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে 'পরিবর্তন' নামের একটি প্রতিষ্ঠানও পরিচালনা করতেন তিনি। বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারের জন্য 'বিবেক বাহিনী' তৈরি করেন। কলেজ ও ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সেখানে আসতেন। দাভোলকর যুক্তিবাদী সনাল এডামারাকু এবং বিশিষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারকিলকার-এর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এছাড়াও তিনি 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান রেশনালিস্ট এসোসিয়েশন'-এর সহসভাপতিও ছিলেন। ১৯৯০ থেকে ২০১০-এর মাঝে দাভোলকর দলিত সমাজের মর্যাদা এবং ভারতীয় জাতিব্যবস্থার অবসানের লক্ষ্যেও আন্দোলন জারি রাখেন।

১৯৫৪ সালে ভারতে লাগু হয়েছিল 'দ্য ড্রাগ অ্যাণ্ড ম্যাজিক রেমেডিজ অ্যাক্ট' (Objectionable Advertisements)। কিন্তু তা দিয়েও যাদুটোনা, তুকতাক ইত্যাদির মোকাবিলা

করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ২০১০ সাল থেকেই অন্ধবিশ্বাস (যাদুটোনা) বিরোধী বিল পাস করানোর জন্য মহারাষ্ট্র সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন দাভোলকর। সেই লক্ষ্যেই শুরু হল আন্দোলন। এখানেই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর সাথে সাক্ষাৎ সংঘাত শুরু হল তাঁর। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং শিবসেনার মত রাজনৈতিক দল তাঁর বিরোধিতা করে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো তাঁর প্রস্তাবিত খসড়া বিলকে 'হিন্দু সংস্কৃতি'র বিরোধী বলে ঘোষণা করে। চলতে থাকে মতাদর্শগত সংগ্রাম। তারপরের ঘটনা ওই ২০১৩ সালের ২০শে আগস্ট।

দাভোলকরের খুনের একদিন পর অর্থাৎ ২১শে আগস্ট মহারাষ্ট্র সরকার কুসংস্কার ও তুকতাক বিরোধী অর্ডিন্যান্স জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক এর মত বুজরুকির জন্য ৭ বছরের জেল হবে। ডাঃ দাভলকার গত ১০ বছর ধরে কুসংস্কার ও তুকতাক বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হত্যার পর মহারাষ্ট্রের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহান এই অর্ডিন্যান্স জারি করার পদক্ষেপ নেন!

দাভোলকরের মতোই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির হাতে খুন হয়েছেন গোবিন্দ পানসারে, এম. এম. কালবুর্গীর মতো

যুক্তিবাদী মানুষেরা। কিছু বছর আগেই আমরা দেখেছি সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে শিরদাঁড়া সোজা রেখে সাংবাদিকতা করার জন্য খুন হতে হয়েছে। আসলে নরেন্দ্র দাভোলকর এবং বাকিরা একই পথের পথিক। আমরা জানি ইতিহাসে বরাবরই বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষরা নিজেদের সময়ে আক্রমণের মুখে পড়েছেন। কারন তাঁরা প্রত্যেকেই সঙ্গী করেছেন বিজ্ঞানকে। না, শুধুমাত্র প্রযুক্তিনির্ভর পাঠ্যবইয়ের বিজ্ঞান নয়, যুক্তিনির্ভর হাতে কলমে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের প্রগতিশীল দর্শনকে সমাজের প্রত্যেকটা স্তরে নিয়ে যাওয়া, বিজ্ঞানকে পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ না রেখে তা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে পৌঁছে দেবার কাজ নরেন্দ্র দাভোলকরেরা করে গেছেন। তাই হত্যার পরেও আজ নরেন্দ্র দাভোলকর আমাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। শুধুমাত্র শ্রদ্ধা নয়, বরং আমাদের আগামীদিনে পথচলার আদর্শও বটে। আজকেও আমরা অপবিজ্ঞান এর বীজ বুনতে দেখছি প্রত্যহ, কোথাও সরাসরি সরকারি মদতে আবার কোথাও পরোক্ষভাবে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি দ্বারা। আমাদের লক্ষ্য কোনদিকে? যুক্তিনির্ভর প্রগতিশীল সমাজের দিকে? যদি তাই হয়, তবে নরেন্দ্র দাভোলকর আমাদের পথপ্রদর্শক। তাই তাঁকে হত্যার দিনটায় তাঁকে স্মরণ করাটা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতায় না আটকে রেখে তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে এগোলেই তাঁর স্বপ্ন সফল হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানমনস্কতা

-পার্থপ্রতিম পাল

বর্তমান যুগকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ। বর্তমান সময়ের জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে লেগে আছে বিজ্ঞানের পরশ। বিজ্ঞানের ছোঁয়াতে এখন মানুষ পরিহার করেছে নানা রকম কুসংস্কার, গ্রহন করেছে নানা রকম টেকনোলোজি ও তত্ত্ব। তার পরেও মনে প্রশ্ন জাগে এই বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ কি বিজ্ঞানমনস্ক হচ্ছে নাকি শুধুই বিজ্ঞানের দানগুলো নিচ্ছে? নাকি শুধুই শিখছে বিজ্ঞান আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও টেকনোলোজির ব্যবহার। ‘বিজ্ঞান শিক্ষা’ ও ‘বিজ্ঞান-মনষ্কতা’ শব্দ দুটো স্বাভাবিক ভাবে একই মনে হলেও এদের ভেতর বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। এ দুয়ের পার্থক্য জানার আগে জানা উচিত বিজ্ঞান কি? সহজ ভাষায় বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান, যে কোন জ্ঞানের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণকে বিজ্ঞান বলা হয়। উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, “বিজ্ঞান হচ্ছে বিশ্বের যাবতীয় ভৌত বিষয়াবলী পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, যাচাই, নিয়মসিদ্ধ, বিধিবদ্ধ ও গবেষণালদ্ধ পদ্ধতি যা জ্ঞানকে তৈরিপূর্বক সুসংগঠিত করার কেন্দ্রস্থল। ল্যাটিন শব্দ সায়েন্টিয়া থেকে ইংরেজি সায়েন্স শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শব্দটির অর্থ ‘বিশেষ জ্ঞান’। আবার বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর

সাথে দর্শনেরও যোগসূত্র পাওয়া যায়। এদিক থেকে “বিজ্ঞান হচ্ছে একটা দর্শন, যে দর্শনের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে প্রশ্ন করা, কার্যকারন অনুসন্ধান করা।”

বর্তমানে কর্পোরেট সমাজে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত কর্পোরেশনকেন্দ্রিক। এখানে আছে কর্পোরেশনের প্রয়োজন অনুসারে সিলেবাস। এর মাধ্যমে তাদের গোলামির জন্য যা যা লাগবে তা শেখানো এবং দক্ষ গোলামে পরিণত করা। বলা যায় “শিক্ষাব্যবস্থা এখন Two M সিনড্রোমে ভুগছে- marks and money। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এখানে ভালো রেজাল্ট করে বের হয়ে কোনো কর্পোরেশনে চাকুরী করা এবং টাকা উপার্জন করা। আর এ’জন্য বিজ্ঞান শিক্ষাকেই সবাই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করলে করে খাওয়ার অভাব হবে না তার কারন বুঝি এই। এভাবে সেই সব শিক্ষার্থী বিজ্ঞান সিদ্ধ হয় (এই হচ্ছে কর্পোরেশনের লক্ষ্য সত্যি, কিন্তু তাদের বিজ্ঞানমনস্কতার উৎকর্ষ সাধিত হয় কি? কারন “বিজ্ঞান-মনস্কতা মানে নিছক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতনতা নয়, প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষতা বা সপ্রতিভতা নয়। বিজ্ঞান-মনস্কতা মানে হল বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, যুক্তিশীল মননচর্চা, বৈচারিক চিন্তাকৌশল।” প্রশ্ন করে জানার স্পৃহা হচ্ছে বিজ্ঞান-মনষ্কতা। কোনো বিষয়ের এক কথায় সহমত প্রকাশ না করে বরং সংশয় প্রকাশ করা এবং যৌক্তিক ভাবে তার

বিশ্লেষণ করা। মুলত “বিজ্ঞানমনস্কতা বলতে সেই দুটি বৈশিষ্ট্যকে বুঝায় যা বিজ্ঞানকে ধারণ করতে অপরিহার্য। এই দুটি বৈশিষ্ট্য হলো – প্রশ্ন করার প্রবণতা এবং কার্যকরণ অনুসন্ধানের প্রবণতা। সুতরাং, যে ব্যক্তি অন্তরে উপরোক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করবেন তিনিই বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে বিবেচিত হবেন। আর এমন বিজ্ঞানমনঙ্ক হতে হলে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু প্রশ্ন করে, যৌক্তিক ভাবে বিশ্লেষণ করে জানার স্পৃহা। যেমন, “আহমদ শরীফ বা হুমায়ুন আজাদ, কেউই বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। দর্শন ও সাহিত্যের ছাত্র হয়েও তাঁরা বিজ্ঞানমনস্কতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তেমনি স্বশিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন আরজ আলী মাতুব্বর। তিনিও স্বেচ্ছায় প্রশ্ন ও কার্যকরণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রমাণ রেখেছেন। একই কথা প্রযোজ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেলায়ও। তিনিও বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। কিন্তু, তিনি গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন শিশুদের। শিখিয়েছেন আহ্নিক গতি বার্ষিক গতির কার্যকরণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একজন বিজ্ঞানমনঙ্ক মানুষ ছিলেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনকে তাঁর যুক্তি-তর্ক দিয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সত্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন যা কবির আধুনিক যুক্তিবাদী মন ও বিজ্ঞানমস্কতাকে প্রকাশ করে।

আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন না যে মানুষের পর্যবেক্ষণের ওপরই নির্ভর করে আছে মহাবিশ্বের বাস্তব সত্য।বোরের কোয়ান্টাম থিয়োরিতে কোপেনহেগের ব্যাখ্যার সাথে এখানেই ছিল তাঁর বিরোধ। সেই আলোকেই তাদের আলাপচারিতা হয়েছিল, হয়েছিল যুক্তি তর্ক। সমাজ নানা রকম অন্ধ ধ্যান ধারণাতে পূর্ণ। কিছুদিন আগেও বিশ্বাস করা হতো ডাইরিয়া, কলেরা, কুষ্ঠ রোগ গুলো নানা রকম খারাপ জ্বীনের আছড়। এমনকি এখনও মানুষ বিশ্বাস করে ঈশ্বর, আল্লাহ, গড, জ্বীন, ভুত, বিভিন্ন অশরীরী আত্মা। এবং এদের থেকে বাঁচার জন্য গ্রহণ করে তাবিজ, কবচ, পানিপড়া। এখনও অনেক মানুষ বাচ্চা না হওয়া জন্য স্মরাণাপন্ন হয় বিভিন্ন কবিরাজ বা তান্ত্রিকের। শুধু অশিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ না; শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত ও বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষও। যেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে বাচ্চা হওয়ার সাথে ক্রোমোজম, ডিম্বাণু, শুক্রানুর সম্পর্ক। অনেক সময় শোনা যায় অনেক ডাক্তারও নাকে কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে রুগীকে পরামর্শ দেন কবিরাজের কাছে যেতে। অর্থাৎ তারা বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন ঠিকই কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক হচ্ছেন না। বিজ্ঞানের তত্ত্ব, থিয়োরি জানছেন কিন্তু অন্তরে তা ধারণ করতে পারছেন না। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়,ধর্মিয় নানাবিধ কারন তাদের বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এখানে বিজ্ঞান শিক্ষাটাকে হেয় করছি না বরং বলতে চাচ্ছি বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে চাই

বিজ্ঞান মানসিকতা। প্রতি বছর অসংখ্য শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। অনেকে বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করেছে কিন্তু উদ্ভাবনী মানসিকতা নেই, আঁকড়ে ধরে আছে সমাজের নানা রকম প্রচলিত বা প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বিশ্বাস করছে নানা রকম কুসংস্কার। এরূপ শিক্ষা ব্যক্তিকে শুধু দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলবে। টাকার চাহিদা এখানে মুখ্য। এইরকম মানসিকতা থেকে বিজ্ঞানকে শুধু চর্চা করাই হয়, নিজেকে শুধু কর্পোরেট জগতের জন্য প্রস্তুত করাই হয় কিন্তু, প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে মস্তিষ্কে যে যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতার অনুরণন ঘটার কথা, তা আর ঘটার সুযোগ পায় না। কুসংস্কার, অপশিক্ষা আর রাষ্ট্রীয় দৈন্যের ফলে অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যায় এইদেশের বেশীরভাগ শিক্ষার্থীর বিজ্ঞানমনস্কতা; বিজ্ঞান আটকে যায় সীমিত পরিসরের মধ্যে। আবার বিজ্ঞানমনস্কতা শুধু বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্যই প্রয়োজন না বরং ইতিহাস, ভূগোল সহ সকল বিষয় এমনকি জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে প্রয়োজন। সকলেরই জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিটা বিষয় বিশ্লেষণ করা উচিৎ, প্রশ্ন করা এবং সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে বের করা উচিৎ।

মোট কথা বিজ্ঞানমনস্কতা চাই সবার জন্য। আমাদের বিজ্ঞানমনষ্কতার পেছনে অন্যতম বাধা হয়ে আছে কর্পোরেট সমাজ, রাষ্ট ও ধর্ম। কর্পোরেট সমাজ চায় তার জন্য দক্ষ

কর্মী। সে জন্য নিজের প্রয়োজন মতে বেঁধে দিয়েছে সিলেবাস। কর্পোরেশনের জন্য যতটুকু দক্ষতা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে দিয়েছে সিলেবাসের মাধ্যমে। যার ভালো দক্ষতা থাকবে, কর্পোরেশনের কাছে তার গুরুত্ব তত বেশী হবে। আর এজন্য মাইনেও পাবে বেশি। তাই কর্পোরেশনে চাকুরী করার জন্যই বর্তমানে শিক্ষা। বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে সকল প্রকার শিক্ষাই এমন। এভাবেই বিজ্ঞানমনস্ক হতে বাধা সৃষ্টি করছে কর্পোরেশন। রাষ্ট্রের স্বভাবই খবরদারি করা, বল প্রয়োগ করা। আর বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি মাত্রই স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তাই রাষ্ট্র এবং বিজ্ঞানমনস্কতা পুরোপুরি সাংঘর্ষিক একটা ব্যাপার। পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম নানা রকম ধ্যান, ধারণা, কুসংস্কারচ্ছন্নতা। বহুযুগ পুর্বের সৃষ্ট এ ধর্মগুলো শুধুই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে টিকে আছে। আর এ বিশ্বাস ছোটবেলা থেকে একটা মানুষের ভেতরে অবস্থান করতে করতে এমন একটা শক্ত অবস্থানের সৃষ্টি করে যা ভাঙ্গা যায় না। ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে শেখা তত্ত্ব গুলো এখানে খাটে না। যদিও তা প্রমাণিত। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে চাই সমাজের সুষ্ঠ পরিবেশ। চাই চিন্তার স্বাধীনতা, প্রশ্ন করার স্বাধীনতা, বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা। চাই ভাবনার সময়। চাই বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্য নির্ভীক পরিবেশ। সেই প্রকাশিত সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নতুন

তত্ত্ব উপস্থাপনের ব্যবস্থা। যৌক্তিকতার মাধ্যমে গ্রহণ করার মানসিকতা। এসবই তো বিজ্ঞানমনস্কতা।

স্বাধীনতার অমৃত

-মহম্মদ মহসীন

স্বাধীনতার অমৃত, তার উৎসব, মহোৎসব মানে মচ্ছব। ১৯৪৭ এর এই রকম এক আগস্টের ১৫ তারিখে, ভারত লাভ করেছিল স্বাধীনতা। কী পেয়েছিল তাতে আম জনতা? তার আগে দেখি আমাদের নেতারা কী পেয়েছিল। তারা পেল দুটো দেশ। একটা ভেঙে দুটো। তাই দুটো রাজা, দুটো মন্ত্রী, দুটো সেনাপতি, মন্ত্রী সান্ত্রী পাত্র মিত্র কোটাল, সব দুটো দুটো করে। যথার্থ স্বাধীনতা পেল এরাই। স্বাধীনতার প্রভুত্ব চালাবে এরাই প্রজাদের উপরে। দিন- মাস- বছরের একক, দশক, শতক ধরে।

এ নাহয় গেল নেতাদের কথা। এখন বলি তাহাদের কথা, মানে আম, জাম, আতা-জাতীয় জনতার কথা। তারা পেল সদ্য স্বাধীনতার অভিশম্পাত। দেশ ভাগ। নিজ দেশে পরভূম। রাতারাতি জানলো, এই দেশটা ওদের, তোমাদের দেশ তো ওপারে। যথেচ্ছ লুঠতরাজ, খুনখারাপি, দাঙ্গা। অনেক লড়াইয়ের শেষে, নিজের দেশে এসে, জুটলো তাদের ক্যাম্প নামক নরক। সেখানে পেল তারা নতুন নামঃ রিফিউজি। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে এসে নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে করতে তারা ভাবলো, এর নাম তাহলে স্বাধীনতা? কেন এমন হলো। কে দায়ী এই যন্ত্রণার দেশভাগে?

দায়ী তো আমরাই। হ্যাঁ আমরাই। কিভাবে? সেটাই আজ বলি। ছোট থেকে বাবা, মা, পরিবার, সমাজ, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মহা মহাজ্ঞানীদের শিক্ষায়, বলা ভাল কুশিক্ষায়, অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েছি চোখ বুজে। ধর্মের পথে চলেছি। ধর্মের প্রতি ভক্তিতে ভক্তিতে খুইয়েছি মানবিকতার পাঠ, মনুষ্যত্বের ভাষা। ধর্ম বুনে দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বীজ। ধর্ম করে দিয়েছে অন্ধ। তাই দেশভাগে নেতারা বোঝালে, তুমি হিন্দু, কাজেই ঐ দেখ হিন্দুস্থান, ওটাই তোমার দেশ, ওটাই তোমার আবাসস্থান। ওখানে তোমার ধর্ম সুরক্ষিত। নাহলে তোমার ধর্ম আছে খতরে মে।

ধর্মের কাজই তো অন্ধত্বের চাষ। এই চাষে লগ্নী করে ধনীরা, বেনিয়ারা। তারাই বানায় ধর্মের নেতা, রাজনীতির নেতা। এদের চাকরি হলো তোমায় বোঝানো। তুমি মুসলমান, ধর্ম তোমার খতরে মে। ধর্ম করে দিয়েছে অন্ধ। তাই দেশভাগে নেতারা বোঝালে, তুমি মুসলমান, ঐ দেখ পাকিস্তান, ওটাই তোমার দেশ, ওটাই তোমার আবাসস্থান। ওখানে তোমার ধর্ম সুরক্ষিত। ওখানে গড়তে পারবে তোমার ধর্মের রাষ্ট্র।

দেশ হলো স্বাধীন। যারা স্বাধীন হলো, তারাই খেতে পেলে অমৃত। সেই শুরু। সেই স্বাধীনতার অমৃত খেয়ে চলেছে দেশের দু আনা লোক, দেশের চৌদ্দ আনা সম্পদের অধিকারী তারা। আর বাকি চৌদ্দ আনা লোক, পেল দু আনা

সম্পদ, দেশভাগের যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িকতার গরল। কারণ দেশভাগের বীজ তো তোমার মজ্জাতেই, তোমার ধর্মবিশ্বাসে, তোমার জীবন বোধে। তোমার জীবন দর্শণে।

তাই যখন মুক্ত চিন্তা করতে দেখলেই রে রে করে তেড়ে আসি, তাড়িয়ে তাদের ঘর ছাড়া করি, দেশছাড়া করি, মারি, ধরি, খুন করি, তখন কি ভেবে দেখবে না, কে দায়ী এর জন্য? একবার তোমায়, ভেবে দেখার আর্জি জানাই, তোমার এই বদ্ধ চিন্তন, এই অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, এমনি ভাবেই লুট-পাটের পথ প্রশস্ত করবে ঐ ধনীদের, বেনিয়াদের, নেতাদের, ধর্মগুরুদের। যখনি ধার্মিক তথা ধর্মান্ধের দল, সামনে "কুকুর বেড়াল মেরো না, নাস্তিক পেলে ছেড়ো না" লেখা ফেস্টুন সাজিয়ে মিছিল করে, মুক্তমনাদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করে, তাদেরকে অত্যাচার করার নানান আইন বানায়, তাদের উপর নানান ফন্দি ফিকিরি কানুন চাপায়, তখন স্মরণ করিয়ে দিই, গায়ের জোরে ধর্ম প্রবর্তকদের অন্যায়, অনীতি, অনাচারের ইতিহাস চাপা দেওয়া যায় না, তাদের প্রণীত ধর্ম গ্রন্থের অন্যায়গুলিকে ন্যায় বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, ভুল গুলিকে সঠিক বলে প্রচলিত করা যায় না, মিথ্যাগুলিকে সত্য বলেও চালানো যায় না। মুক্তমনে শিখলে, জানলে, পড়লে, ভাবলে সে সব মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে যায়, ধর্মের ফানুশ ফেটে কোথায় যে ভ্যানিশ হয়ে যায়, তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কত শত ধর্ম, যারা দাবী করেছিল, তাদেরটাই একমাত্র সত্য ধর্ম, ঠিক তোমরা যেমন দাবী করে থাকো, কালের কবলে কোথায় যে হারিয়েছে তার ইয়ত্তা পাওয়া যায় না, নাম ঠিকানা হারিয়ে আজ সে সব সত্য ধর্ম মানবজাতির স্মৃতির অতল থেকেও বেপাত্তা। তাহলে বোঝা গেল তো, কেমন স্বাধীনতা। কেন দেশভাগের যন্ত্রণা, কে দায়ী তার জন্য?

এই দেশভাগের বীজ আমাদের ধর্ম বিশ্বাস। সে বীজের অঙ্কুর বেরোনোয় দরকারী বাতাস দিয়েছে আমাদের ভক্তি-নিঃশ্বাস। চারার বৃদ্ধিতে জলসেচ দিয়েছে আমাদের অন্ধ বিশ্বাস। সে বিষবৃক্ষ এখনো বেড়ে চলেছে।

কাজেই বন্ধু এখনো যদি না জাগো, এখনো যদি না চিন্তা করো মুক্তভাবে, এখনো যদি না পরিত্যাগ করতে পারো আজন্ম লালিত অযৌক্তিক জীবনাচরণ, যাকে তুমি ভেবেছো তোমার জীবনের আদর্শ, এখনো যদি না ত্যাগ করতে পারো তোমার হিন্দু-সত্তা, মুসলিম-সত্তা, তাহলে স্বাধীনতার অমৃত খেয়ে যাবে ওরাই। যুগ যুগ ধরে। তোমার জন্য উপহার অশিক্ষা, শিক্ষার নামে ধর্মশিক্ষা, কুশিক্ষা; আধুনিক চিকিৎসার নামে হোমিওপ্যাথীর চুষিকাঠি, মান্ধাতার আয়ুর্বেদ, চিকিৎসার নামে অভ্যাসের শৈলী যোগ, স্বাস্থ্য কাঠামোর উন্নতির নামে আরো শোষণ। তোমার জন্য উপহার বেকারত্ব, চাকুরির নামে শোষণ। শোষণ, শোষণ

আর শোষণ। রাষ্ট্র ক্ষমতা কায়েম করে শুধু শোষণ আর শোষণ।

নির্বিবাদে এই শোষণ চালানোর জন্য মুক্তমনের চিন্তনকে দমন করা, চাপা দেওয়া জরুরি। তাই রাষ্ট্র মুক্ত চিন্তনের বিরুদ্ধে। ধর্ম বিশ্বাস প্রচলিত রাখতে লগ্নী করে বিভিন্ন দিক দিয়ে। ধর্ম বিশ্বাসরূপ অন্ধবিশ্বাসকে সুশিক্ষা বলে চালাতে সমর্থন যোগায় সকল দিক দিয়ে।

কিন্তু ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ আচকিত করে মাঝে মাঝেই। ধর্ম বিশ্বাস ফোঁড়া ফেটে পুঁজ বেরোয় হর হামেশাই। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, এইসব স্বাধীনোত্তর দেশের সংখ্যালঘুরা, দলিতেরা নিপীড়িত হয় ধর্মবিশ্বাসের "সুশিক্ষার গুণে"। দেশের সেই '৪৭ এর ১৫ই আগস্টে কিংবা আবার পরে '৭১ এর ২৬ শে মার্চে স্বাধীনতা পাওয়া প্রভুরা, রাজারা, মন্ত্রীরা তাদের মহারাজ বেনিয়াদের দেওয়া চাকুরির দায়িত্ব পালন করে চলে অন্ধবিশ্বাস চাষের কর্তব্যে। ব্রেন ওয়াশড ধর্মগুরুগুলিও পুরোদস্তুর ময়দানে নেমে দায়িত্ব পালন করে চলে আরো আরো ব্রেইন ওয়াশ করার "শুভ কর্মপথে"।

আর ব্রেন ওয়াশ করতে পারলেই কেল্লা ফতে। আজকাল বিভিন্ন লেখায় দেখা যায় অমুক ধর্ম গুরু স্বাধীনতা আন্দোলনে হ্যান করেছিল, ত্যান করেছিল। ধর্মগুরুর বৌটিও না কি স্বাধীনতা সং গ্রামে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কত কি

সাহায্য করেছিল। স্বাধীনতা সং গ্রামের বিপ্লবী, জীবনের প্রথম দিকে অনেক কাজই করেছেন, কিন্তু পরে ধর্মের আঁধার আশ্রয়ে গিয়েছেন। ধর্মের লোকেরা কিন্তু তার আলোকিত জীবন নিয়ে যত না আন্দোলিত, তার অন্ধকারময় কাপুরুষকার জীবনকে আলোকিত বলে বলে শতগুণ উচ্ছ্বসিত, অন্ধকারময় কাপুরুষিক জীবনকে, তার জীবনের মিথ্যাকে, সত্য দর্শণ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে সহস্রমুখে গোয়েবেলসীয় প্রচারে উৎসর্গীকৃত। হায়, বিশ্বকে বিপথে চালিত করতে ধর্মবিশ্বাসের জুড়ি নাই। তাই এই পথকেই নির্দ্বিধায় বেছে নেয় রাজা তৈরির মালিকেরা। দেশের সব শোষণের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখে এভাবেই।

স্বাধীনতার লড়াই লড়েছিল ভগৎ সিং। স্বাধীনতার জন্য। মুক্তির জন্য। বলেছিল, মুক্তি মানে সকলের জন্য খাদ্য, সকলের জন্য আবাস, সকলের জন্য সুশিক্ষা, সকলের জন্য কাজ, সকলের জন্য নিরাপত্তা, সকলের জন্য বাঁচার অধিকার। মুক্তি মানে শোষণহীন সমাজ। মুক্তি মানে অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিরন্তর কাজ। অন্ধবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস তাই সমাজের ক্যানসার। এর সঠিক চিকিৎসা হলো মুক্ত মননের পরিচর্চা, বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার পাঠদান, যুক্তিশীল মানসিকতা গঠনের পরিসর নির্মাণ।

কিভাবে হবে সেই নির্মাণ?

ধার্মিকেরা যেমন যুক্তিবাদীদের মারে, ধরে, হত্যা করে, যুক্তিবাদীরা কি পাল্টা মার দেবে? খুন করবে? ধার্মিকেরা যেমন যুক্তিবাদ দমনের জন্য ব্লাসফেমি আইন বানায়, এই আইনের বলে মুক্তচিন্তনশীল লোকেদের উপর অত্যাচার চালায়, যুক্তিবাদীরাও কি পাল্টা এসব করবে?

মোটেই না। যুক্তিবাদীদের মূল শক্তি হল তাদের যুক্তি, তাদের যুক্তিশীল মানসিকতা, তাদের সত্যকে সত্যরূপে বোঝার ক্ষমতা।

ধার্মিকদের ধর্মগ্রন্থের অসারতা, অন্যায়, অনৈতিকতা যুক্তিনীষ্ঠভাবে দেখিয়ে দেওয়াই যুক্তিবাদী আন্দোলনের মূল কাঠামো।

মানুষ কিন্তু ভিত্তিগতভাবেই র‍্যাশানাল। তাকে বোঝানো আদৌ কঠিন নয় যে গাধা আকাশে উড়তে পারে না। ঢেকিও না। সূর্য কোনো ছোট্ট নরম কবোষ্ণ রুটি নয় যে বানর, হনুমানে তা বগলে পুরে নেবে। বানরে উড়তেও পারবে মন্ত্রবলে, এ বিশ্বাসে তাদের মনে দ্বিধাই মেশায়। চাঁদ কোনো খেলনা নয় যে তাকে কেউ দ্বিখণ্ডিত করার পর সেটি পৃথিবীতে নেমে এলেও পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয় না তো বটেই, সেটিকে আবার আঙুলের ইশারায় জুড়েও দেওয়া যায়। এসব যে আষাঢ়ে গল্প তা বুঝতে কারুর বিন্দ্যমাত্র কষ্ট হয় না। এই রকম ধর্মগ্রন্থ দিয়েই তাদের অন্ধবিশ্বাস ভাঙতে হবে।

"...সত্যসন্ধী এবং সত্যাশ্রয়ী না হইলে কি মানুষ, কি জাতি, কিম্বা কি দেশ, কাহারও মাথা খাড়া করিয়া উঠিবার সাধ্য নেই।...মিথ্যার উপর কোনও মহৎ অনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় না। তোমরা সত্যকে স্বীকার করো ও বরণ করো।"

- আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

দেশপ্রেম: একটি উপযুক্ত সংজ্ঞার খোঁজে

-চিত্রদীপ সোম

হয়ত বড় অসময়ে এ লেখায় হাত দিয়েছি। বা হয়ত এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। সবে পনেরই আগষ্ট গেল। দেশপ্রেমের ঝড় প্রত্যক্ষ করেছি দু'দিন আগেই। বাইকে, গাড়িতে, বাড়ির মাথায় পতাকায় পতাকায় ছয়লাপ। মাইকে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। টিভিতে 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা' গানের সাথে ভারী বুটের কুচকাওয়াজ আর আকাশে যুদ্ধ বিমান থেকে পুস্পবৃষ্টি। দেখতে দেখতে ভারী আরাম বোধ করি। অনুভব করি এই তো আমার দেশ। ওই যে সার দিয়ে যাওয়া ট্যাঙ্কের সারি, ওই যে কম্যাণ্ডের তালে তালে সারিবদ্ধ বুটের আওয়াজ, ওই যে মিলিটারি গাড়ির মাথায় রাখা স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপনাস্ত্র, এটাই তো আমার দেশ। ওই যে টিভিতে দেখাচ্ছে দেশের সেনা একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছে শত্রুসৈন্যকে খতম করে দেবার, আর তারপর এগিয়ে যাচ্ছে রণক্ষেত্রে, এটাই তো আমার দেশ। ওই যে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে পতপত করে উড়তে থাকা তেরঙা পতাকা, ওটাই আমার দেশ।

কে দেশপ্রেমিক নয় আজকের দিনে? সাতে পাঁচে না থাকা হরিপদ কেরানী শ্যামলবাবু, দু'নম্বরি ওষুধের ব্যবসায়ী রমেশবাবু, আয়কর দপ্তরে কাজ করা দু'হাতে ঘুষ নেওয়া

অনিলবাবু, স্থানীয় মস্তানদের থেকে তোলা আদায়কারী, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পদলেহনকারী পুলিশ অফিসার সুনীলবাবু, পণের দায়ে বউকে ধরে পেটানো স্বরূপবাবু, বাড়ির ইলেকট্রিক মিটারে কারচুপি করে রাখা সুব্রতবাবু, বাড়ির শিশু গৃহশ্রমিককে খুন্তির ছ্যাঁকা দেওয়া অনিতা দেবী, সবাই সবাই দেশপ্রেমিক আজ। দেশপ্রেম আজ এতটাই সস্তা, এতটাই সহজলভ্য। দেশপ্রেমিক হবার জন্য আজ আর দেশের জন্য কিছু না করলেও চলে। দেশের মানুষের জন্য জীবনপাত না করলেও চলে। কেবল বুকে বা বাইকে পতাকার স্টিকার লাগিয়ে ঘোরা, টিভিতে মিলিটারি বুটের আওয়াজ বা মাইকে 'অ্যায় মেরে বতন কে' শুনে বুকের মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠা আর দুপুরে টিভিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খান দুই গরম গরম সিনেমা দেখলেই দেশপ্রেমিক হবার কোটা সম্পুর্ন। আর তাই দেশপ্রেমিক হবার এই সহজ প্রতিযোগিতায় কেউ পিছিয়ে নেই আজ।

আর দেশপ্রেমের এত বিচিত্র আয়োজনে গুলিয়ে যায় একটা সোজা প্রশ্ন, কাকে বলবো দেশ, কাকে বলবো দেশের প্রতি প্রেম।

দেশ কী? তা কি শুধুই কাঁটাতারে ঘেরা একটা ভূখন্ড? শাসকের মগজধোলাইয়ের শিকার অধিকাংশ মানুষের কাছে দেশ মানে তাই-ই। কাঁটাতারে ঘেরা এক ভৌগলিক এক

সীমানা মাত্র। এক রঙিন মানচিত্র। আর সেই ভৌগলিক সীমানাকে অখন্ড রাখতে চাওয়াই দেশপ্রেমের একমাত্র সংজ্ঞা আজ মানুষের কাছে। এবং এর জন্য সাধারণ মানুষকে একটুও দোষ দেওয়া যায় না, কারণ বহু ঢক্কা নিনাদে, বহু ব্যায় করে মিডিয়া, স্কুল পাঠ্যপুস্তক থেকে পোষ্য নানা বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে সরকার জনগনের মাথার মধ্যে দেশপ্রেমের এই সংজ্ঞাই ঢুকিয়ে দিতে চায়। বোঝাতে চায় দেশ মানে কেবল কাঁটাতারে একটা ভূখন্ডমাত্র। আর সেই ভূখন্ডের রক্ষকরাই দেশের আসল সেবক। দেশের সীমানাকে যেনতেন প্রকারে অক্ষুন্ন রাখাই একমাত্র দেশপ্রেমের মাপকাঠি।

কিন্তু কেউ যদি শাসকের মগজধোলাইয়ের শিকার না হন, যদি সেই বিরল কিছু মানুষের মধ্যে পড়েন যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে অনুধাবন করবেন শুধু সীমানা দিয়ে দেশের ব্যখ্যা হয় না। দেশ মানে সেই সীমানার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জনগোষ্ঠী, সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রানী, সবকিছুই। আর তাই দেশপ্রেম মানে কেবল দেশের মাটি বা সীমানার প্রতি প্রেম নয়, “দেশপ্রেম মানে দেশের মানুষের প্রতি প্রেমও”। মানুষ ছাড়া দেশ অর্থহীন। মানুষই তৈরী করে এক দেশের সাথে অন্য দেশের সীমানা। পৃথিবীতে যখন মানুষ আসেনি, প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসররা যখন ঘুরে বেড়াত পৃথিবীর বুকে, তখন কোনটা ছিলো ভারত, কোনটা ছিলো পাকিস্তান, কোনটাই

বা ছিলো রাশিয়া? আবার হঠাৎ করে যদি মানুষ বিলুপ্ত হয়ে যায় দুনিয়া থেকে তখন কে বলে দেবে কোনটা ভারত আর কোনটা পাকিস্তান? এই যে কাঁটাতারে ঘেরা এই পৃথক পৃথক ভূখন্ডের ধারণা, এটা তো মানুষেরই সৃষ্টি। সেই মানুষই যদি না থাকে তাহলে কী হবে সেই দেশ নিয়ে?

অথচ আজ শাসকগোষ্ঠী দেশপ্রেমের যে সংজ্ঞা আমাদের মাথায় ঢোকাতে চাইছে তাতে দেশের সীমানার কথা আছে, সীমান্তরক্ষাকারী প্রহরীদের কথা আছে, নেই কেবল দেশের মানুষের কথা। নেই রামা কৈবর্ত্য আর হাসিম শেখদের কথা। দেশপ্রেমিক বলতে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে সীমান্ত রক্ষাকারী সৈন্যদের কথা, কিন্তু ভেসে ওঠে না রামা কৈবর্ত্য বা হাসিম শেখদের কথা, যারা রোদ ঝড় মাথায় নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়। ভেসে ওঠে না হাবিব মোল্লা বা কালু প্রামাণিকদের কথা, যারা কারখানায় হাতুড়ি পিটিয়ে সচল রেখেছে এ দেশের অর্থনীতিকে।

সৈন্যদের পেশার প্রতি আবেগে গদগদ ভাবকে কিছুক্ষনের জন্য ছুটি দিয়ে ভাবুন তো, দেশকে সচল রাখতে কার অবদান বেশী, একজন সৈন্যের, না একজন কৃষকের? একজন সৈন্যের, না একজন শ্রমিকের? আজ সারা পৃথিবী থেকে সৈন্যবাহিনী তুলে দিলেও পৃথিবী যেমন চলছে তেমনই চলবে। কিন্তু আজ যদি সারা পৃথিবীর কৃষকরা চাষ

করা বন্ধ করে দেয়? যদি সারা পৃথিবীর শ্রমিকরা সমস্ত কারখানা বন্ধ করে দেয়? যদি সারা পৃথিবীর স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিষেবা দেওয়া থামিয়ে দেয়? ভাবতে পারছেন কী হবে তারপরে? চলবে তো তারপর পৃথিবী স্বাভাবিকভাবে? নাকি এক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়াবে তা? দেশকে সচল রাখতে কে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাহলে?

তাহলে টিভিতে, মিডিয়ায় কেন দেশপ্রেমের নিদর্শন হিসাবে ঠাঁই পায় শুধু উর্দিধারী সীমান্তরক্ষীরা? কেন রামা কৈবর্ত্য বা হাবিব মোল্লারা নয়? কেন তারা সিনেমায়, গানে, কুচকাওয়াজে, কাব্যে সর্বত্র উপেক্ষিত? কেন সীমান্তে মৃত সেনারা শহীদের সন্মান পায়, কিন্তু চাষ করতে গিয়ে বজ্রপাতে বা সর্পাঘাতে মৃত কৃষকরা থেকে যায় উপেক্ষিত? কেন সৈন্য মারা গেলে আবেগে ছলছল করে ওঠে আমাদের চোখ, কিন্তু দেনার দায়ে গত পাঁচ বছরে প্রায় দেড় লক্ষ কৃষক মৃত্যুর খবর বিন্দুমাত্র ঝড় তোলে না আমাদের হৃদয়ে? কেন এদেশে সীমান্ত রক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকার অস্ত্র আসে, বিদেশ থেকে যুদ্ধ বিমান কেনা হয়, কিন্তু রামা কৈবর্ত্য বা হাসিম শেখরা যাতে ভালো থাকে, তাদের পেটে যাতে দুবেলা খাবার জোটে, তার ব্যবস্থা করা হয় না? কেন আজ ভারত পৃথিবীর অন্যতম সামরিক শক্তিধর দেশ হওয়া সত্ত্বেও আজও ভারতের হাজার হাজার গ্রাম বিদ্যুতহীন? কেন আজ ভারতের কাছে রাফায়েল

কেনার টাকা থাকে, কিন্তু থাকে না প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে নূন্যতম স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার টাকা? কেন ভারতের পরমানু বোমা পরীক্ষার টাকা থাকে, অথচ থাকে না প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার টাকা? মানুষের মুখে খাবার না দিয়ে, মানুষের নুন্যতম চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে, মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা না করে যারা হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র কেনে, যারা স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ কমাতে কমাতে ১% এর কাছাকাছি নিয়ে আসে, যারা নোট বাতিল, জিএসটি সহ নানা উদ্ভট পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে ৪০% ছোট ব্যবসাকে ধ্বংস করে অসংখ্য পরিবারকে ঠেলে দেয় বিপদের মুখে, যারা একের পর এক সরকারী সংস্থাগুলিতে তুলে দেয় বেসরকারি হাতে, যারা ছাঁটাইয়ের খাড়া নামিয়ে এনে হাজার হাজার পরিবারকে ঠেলে দেয় ধ্বংসের পথে, এভাবে দেশের মানুষের জীবনকে যারা করে তোলে সঙ্গীন, তারা যে আদৌ 'দেশপ্রেমিক' নয় বরং 'দেশের শত্রু' এটা কবে বুঝবো আমরা? কবে কাটবে আমাদের চিন্তাধারার এই অস্পষ্টতা? দেশের শত্রু মানে কি কেবল পাকিস্তান? যাদের জন্য আজ দেশের মানুষের এই চরম দুরবস্থা তারা দেশের শত্রু নয়? আর যদি তাই হয় তাহলে তাদের বিরোধিতা করাটা, তাদের মুখোশ উন্মোচন করাটা কেন দেশপ্রেম নয়? এদের বিরুদ্ধে মানুষকে তাদের অধিকার বুঝে নেবার লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করাটা কেন দেশপ্রেম নয়?

দেশপ্রেম মানে শুধু সীমান্ত পাহাড়া দেওয়া নয়, মানুষকে তার অধিকার আদায়ের লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করাটা, রাষ্ট্রীয় মগজ ধোলাইয়ের কুহেলিকা থেকে মানুষকে বের করে এনে মুক্ত মনে চিন্তা করতে শেখানোটাও দেশপ্রেম, দেশের মানুষের জন্য ক্ষেতে ফসল ফলানোটাও দেশপ্রেম, কারখানায় হাতুড়ি পেটানোটাও দেশপ্রেম, হাসপাতালে রাত জেগে মুহুর্ষু রোগীর সেবা করাটাও দেশপ্রেম। দেশ শুধু সীমান্তের কাঁটাতার আর সৈন্য দিয়ে তৈরী নয়, দেশ আরো অসংখ্য সাধারণ মানুষ দিয়েও তৈরী। সেইসব মানুষের সেবা করাটা, তাদের জাগতিক ও মানসিক উন্নতির চেষ্টা করাটাই প্রকৃত দেশপ্রেম। আর সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয় এমন কাজ করটাই দেশদ্রোহীতা। এই সহজ সরল উপলব্ধিটা যতক্ষন না হবে ততক্ষন রাষ্ট্রীয় মগজধোলাইয়ের পুতুলই থেকে যাবেন আপনি।

বর্তমানে দেশপ্রেমিক হবার আর এক সহজ পথ পাকিস্তানকে তেড়ে গাল দেওয়া। আমরা ভুলে যাই নিজের মায়ের প্রতি ভালোবাসা প্রমান করার রাস্তা পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের মা-কে তেড়ে গাল পাড়া নয়। আপনি নিজের মা-কে ভালোবাসেন সেটা তখনই প্রমানিত হবে যখন আপনি আপনার রোজগারের টাকা দিয়ে মায়ের জন্য পুষ্টিকর খাবার কিনে আনবেন, তার জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন, তার জন্য ভালো জামা কাপড় কিনে আনবেন। তখনই কেবল আপনাকে মায়ের সুসন্তান বলা

যাবে। মায়ের প্রতি আপনার ভালোবাসা তখনই একমাত্র পরীক্ষার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হবে। তার বদলে আপনার রোজগারের টাকায় যদি আপনি মায়ের জন্য খাবার না কিনে, তার অত্যাবশ্যক ওষুধ না কিনে, সেই টাকায় চকচকে ভোজালি কেনেন পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের মা কে খুন করার জন্য, তাহলে সেটা আর যাই হোক মার্তৃপ্রেম বা মাতৃভক্তি নয়। নিজের মায়ের প্রতি ভালোবাসা প্রমানিত হয় না তাতে। বদলে এইটুকু প্রমানিত হয় কোনো কারণে পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের মাকে ঘৃণা করেন মাত্র। ব্যাস। ঠিক একইভাবে শুধু পাকিস্তানকে ঘৃণা করলেই বা দেশের সেনার প্রতি ভক্তিতে গদগদ হলেই আদৌ আপনি দেশপ্রেমিক হচ্ছেন না বা দেশের প্রতি আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে না। নিজের দেশের মানুষের প্রতি ইতিবাচক কিছু করার দায়িত্বও একইভাবে থেকে যাচ্ছে। সেটা যতক্ষন না সুষ্ঠুভাবে করছেন ততক্ষন বুকে বা বাইকে যতই তেরঙা স্টিকার লাগান, আর মাইকে অ্যায় মেরে বতন কি লোগো শুনে রক্ত গরম হোক, ওটা ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।

শাসকের শেখানো ছদ্ম দেশপ্রেমের মগজধোলাইয়ের হাত থেকে তাই মুক্ত হই আসুন। আবেগ বিবর্জিতভাবে শিখে নিই কাকে বলে দেশ, কাকে বলে দেশপ্রেম। বুঝে নিই দেশ মানে শুধু দেশের মাটি নয়, দেশের মানুষও। দেশকে

ভালোবাসা মানে শুধু সীমান্ত আর সেনাকে ভালোবাসা নয়, দেশকে ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ দেশের মানুষকে ভালোবাসা, তার জীবনসংগ্রামে পাশে থাকা, তার অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সহযোদ্ধা হওয়া।

এই বোধ ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায় দেশপ্রেম।

"যদি ভগবানের কাছে ন্যায় মিলত, তাহলে দেশে বিচারালয় হতোনা। সরস্বতী যদি জ্ঞান দিতো, তাহলে বিদ্যালয় হতোনা। যদি প্রার্থনা করে রোগ সারতো, তাহলে হাসপাতাল হতোনা। কাজ না করে যদি ভাগ্য বদলাতো, তাহলে কার্যালয় হতোনা। মন্দির ধর্মের দালালদের নিজের দোকান। সেখানে যে যায় সে মানসিক ভাবে গোলাম হয়।"

-Dr. B.R. Ambedkar

বার্নাম এফেক্ট

-পঞ্চানন মন্ডল

আমি শুনতে চাই তাকে,

মস্তিষ্ক মিল পায় যাকে।

আমাদের মস্তিস্ক বিভিন্ন ঘটনার মিল খুঁজতে পারদর্শী। যে কোনো ধরণের বক্তব্য বা কথা আমরা নিজেদের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করে যাই। নিজেদের অহংবোধ আর মস্তিস্কের মিল খোঁজার প্রবণতা মিলে আমরা যে কোনো গল্পে নিজেদের খুঁজে পাই, তবে শুধু মিল গুলো! অমিলগুলো যেন নিজে থেকে নিভে যায়।

জ্যোতিষ, রাশিফল,বাবাজী, মাতাজী, সাধুবাবা কথায় বা অতীত বা ভবিষ্যৎবানীতে আমরা এভাবে মিলটাই খুঁজে নিই। কিন্তু একবার ভাবুন অন্য যারা একই রাশিফল পড়ছে তারাও আপনার মতই মিল খুঁজে পাচ্ছে- যদিও তাদের জীবন আপনার জীবন সম্পূর্ণ আলাদা।

এ'যেন কিছুটা এমন -

ধরুন, আপনার ফেসবুক ফ্রেন্ডলিস্টে থাকা একটি মেয়ে/ছেলে স্ট্যাটাস দিয়েছে, “আমি আমার ফ্রেন্ডলিস্টে থাকা একটি ছেলেকে/মেয়েকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি। কিন্তু সাহস করে বলতে পারছি না।কি ভাবে বলি বলুন তো?”

আপনি এই স্টাটাস দেখে তৎক্ষণাৎ ভাবতে পারেন, স্ট্যাটাসটি হয়তো আপনাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে।

মজার বিষয় হলো, ঠিক একইভাবে আরো কয়েকজন ফেসবুক ফ্রেন্ড একই কথা ভাববেন যে, মেয়েটি/ছেলেটি হয়তো তাদের উদ্দেশ্যেই কথাটি বলেছেন। এটাই বার্নাম ইফেক্ট। এই ধরনের বাক্যগুলোতে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয় না। একটা কথা বলা হয়, যা সবার জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু সবাই মনে করে কথাটি কেবল তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

"বার্নাম এফেক্ট" হলো মস্তিষ্কের এমন এক অনুভূতি যখন কোনও সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে নিজের মতামত শুনে বা কোনও রাশিফল পড়ে, আপনি মনে করেন: “এটি অবশ্যই আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ আমার জীবনের কথা"। "আমিতো এমন"। হাঁ আমার জীবনেই তো এমন ঘটেছে"। "আমার সঙ্গেই তো এমনটা ঘটে"। "হাঁ, আমার জীবনে এগুলো ঘটতে পারে"!

১৯৪৮ সালে মনোবিজ্ঞানী বার্ট্রাম ফোরার একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনি তার ছাত্রদের নিয়ে একটা পার্সোনালিটি টেস্ট করেছিলেন। তিনি সকল ছাত্রদের পৃথক ভাবে ডেকে একটি পত্রিকায় যেমন রাশিফল দেয় তেমন

লেখা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন তাদের সঙ্গে কতটা মেলে তা পয়েন্ট দিয়ে জানাতে। সব মিলে গেলে ১০ পয়েন্ট। শিক্ষক একই কথা লেখা কাগজ প্রত্যেকের হাতে তুলে বলেছিলেন দেখো তোমার কথা লেখা আছে কি না। তবে লেখাটি নির্দিষ্ট করে কারোর জন্য ছিল না। তবুও বেশীরভাগ ছাত্র পয়েন্ট দিয়ে জানিয়েছিল তার কথাই লেখা হয়েছে।

কী লেখা ছিল সেই কাগজে? "তুমি সবাইকে আপন ভাবো, ভালোবাসো, কিন্তু সবাই তোমাকে ভালোবাসে না। তোমার কথার সবাই সমালোচনা করে কিন্তু পরে দেখা যায় তোমার কথাই ঠিক ছিল। তোমার কিছু ব্যক্তিগত দুর্বলতা থাকলেও তুমি সেগুলো কাটিয়ে ঠিক নিজের পায়ে দাঁড়াবে।কারণ তোমার মধ্যে যা প্রতিভা লুকানো আছে তা অনেকের নেই।তোমার শৃঙ্খলাবোধ, দায়বদ্ধতা, আত্মবিশ্বাস তোমার সম্পদ। সেগুলোই অন্যদের ঈর্ষার কারণ। তবে তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে বা সঠিক কাজটি করেছো কিনা তা নিয়ে মাঝে মাঝে তোমার সন্দেহ হয়।তুমি কিছু বৈচিত্র্য, বিশালতা, আর নিজস্বতা পছন্দ করো।কিন্তু তা পাওনা বলে মাঝে মাঝে অস্থির লাগে। তুমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পছন্দ করো; আবার উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া সবকিছু বিশ্বাস করো না। তুমি জেনে গেছো যে অন্য লোকের সাথে খুব খোলামেলা হওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই কখনও

কখনও তুমি অন্তর্মুখী, সতর্ক আর মিতভাষী।তাই বলে উচিত কথা বলতে তুমি পিছপা হয় না। তবে তোমার কিছু আকাঙ্ক্ষা অবাস্তব।সেটা তুমিও জানো। তবু তুমি স্বপ্ন দেখো। যাইহোক তোমার মধ্যে যা পজিটিভিটি আছে তা দ্বারা অনেক কষ্টের মধ্যেও তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে"।

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন, শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত চতুরতার সাথে এই লেখা লিখেছেন, যাতে বেশিরভাগ ছাত্রের মনের সাথে তা মিলে যায়। প্রত্যেকে যাতে প্রত্যেকের নিজের মতো বিবরণ খুঁজে পেতে পারে।

এবার আসুন। জ্যোতিষীরা যেভাবে আপনার ভাগ্য বলে দেয়, আমিও সেভাবে আপনার অব্যর্থ ভাগ্যগণণা করে দিই। দেখুন তো এর মধ্যে কয়টি আপনার সঙ্গে মিলে যায়!

১। আপনার যা Quality সেই পরিমাণ সাফল্য আপনি পান নি।

২। আপনি সবার জন্য করবেন, কিন্তু নাম পাবেন না।

৩। আপনি মুখ ফুটে নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারেন না।

৪। আপনার নিকটজনই কিন্তু আপনার সবথেকে বড় শত্রু।

৫। আপনার প্রতি শণি বিরূপ। বৃহস্পতি ও সদয় নয়। এদের সন্তুষ্ট করতে হবে। নইলে বিপদ।

৬। বছরের প্রথম দিকে অর্থভাব খুব শুভ হলেও, বছরের মাঝখানে আর্থিক দিকে একটু সমস্যা দেখা দেবে। তবে সেটা সামলে ওঠার ক্ষমতা আপনার আছে।অর্থের ব্যাপারে সতর্ক থাকলে সঞ্চয় ভাল হবে। অর্থ ভাগ্য খুব ভাল হবে এই বছর।

৭। বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে ও সংসারের সকলের ভালো করতে গিয়ে টেনশন বাড়বে। হার্ট দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা।

৮। সন্তানরা একটু অবাধ্য হয়ে উঠতে পারে।

৯। বিভিন্ন ছোটখাটো কারণে আপনার স্বামী/স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ চলবে।

১০। অনেক দিনের পুরনো কোনও সম্পর্কে কোনও প্রকার চিড় ধরতে পারে।

১১। নিজের প্রচেষ্টায় কিছু আয় বাড়তে পারে।তার জন্য আপনার কলিগদের ঈর্শাভাজন হবেন।

১২। বছরের শেষে ভ্রমণের যোগ আছে।

১৩। প্রেমের বিষয়ে কোনও গোলমাল সামনে এলে, নিজেকে গুটিয়ে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

১৪। সম্পত্তির জন্য ভাই ভাই বিবাদ হতে পারে। তার জন্য মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

১৫। সামনে আপনাকে অনেকে ভালোবাসলেও প্রকৃত ভালোবাসা আপনি পাবেন না।

১৬। আপনি ভালো মানুষ। সবাইকে খুব সহজে আপনি বিশ্বাস করেন। সেই সুযোগে তারা আপনাকে ঠকায়।সবাই তো আর আপনার মতো সরল মানুষ না।

১৭। আপনি সবসময় ঠিক কথাই বলেন। প্রথমে সেই কথার গুরুত্ব কেউ দেয় না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আপনার কথাই সত্যি হয়।

১৮। আপনি অপরের বিপদে সবসময় এগিয়ে আসেন। কিন্তু নিজের কোনো বিপদে কাউকে তেমন পাশে পান না।

১৯। সামনে একটা ফাঁড়া আসছে। সাবধানে থাকবেন। ভগবানকে ডাকবেন। বিপদে তিনি আপনাকে রক্ষা করবেন।

২০। আগামী দু মাস আপনার জন্য অশুভ।

এই সাধারণ কথাগুলো অনেকের সঙ্গে মিলে যাবে।আর আগেই বলেছি আপনার মস্তিষ্ক তো মিলটাই খুঁজে নেবে।যেটা মিলবে না সেটার কথা ভুলেও ভাববে না! বার্নাম এফেক্ট বা ফোরার এফেক্ট!

জ্যোতিষীরা আপনাকে দেখে এই কথাগুলো তাদের মতো করে আপনাকে বলে।তারা পেশেন্ট/ক্লায়েন্ট ঘেঁটে-ঘেঁটে প্রচুর অভিজ্ঞ। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের হিসেব নিকেষ যেমন ঠিকুজি, কুষ্টি, হস্তরেখা বিচার, কপাল বিচার, বাস্তুশাস্ত্র এইসব ভড়ং বা নাটক করে আপনার বিশ্বাস অর্জন করে। এরপর তারা আপনার মন বুঝে এমন সব কথা বলে যে

আপনি সহজেই বিশ্বাস করে নেন যে এগুলো আপনার ভাগ্যে আছে। এই বিশ্বাসের সুযোগ তারা কেন হাতছাড়া করবে! তারা ধান্দাবাজ, চিটিংবাজ বৈ তো কিছু নয়!!

অ্যালোপ্যাথি বনাম গেলোপ্যাথি

-প্রবীর ব্যানার্জি

প্রথম পর্ব।

শুনুন বন্ধু। আমি ডাক্তার নই। তাই বলে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না এমন নয়। আমি যেমন জ্যোতিষী নই, তাই বলে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না এটা হতে পারে না। ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি রান্না করতে পারেন না বলে তাতে নুন, ঝাল, মিষ্টি ঠিক আছে কিনা এটা বলার অধিকার নেই? বিরাট কোহলি আউট হয়েছে কিনা এটা বলার জন্য আম্পায়ার কে শচীনের সমান ব্যাটসম্যান হতে হবে নাকি? আশাকরি সবাই বুঝতে পারলেন আমি কি বলতে চাইছি।

অর্থাৎ আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, আকুপাংচার, য়ুনানি, নেচারোপ্যাথি এরা আদবেই চিকিৎসার যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা সেটা বোঝার জন্য ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আছে বলে আমি মনে করি না। আর অ্যালোপ্যাথি বলে কোনো চিকিৎসা নেই। হোমিওপ্যাথির প্রবক্তাই এরকম একটি নামকরণ করেছেন।আসল কথা হলো উন্নত ও বিকশিত যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান তাকেই অ্যালোপ্যাথি বলে। তাহলে আলোচনায় সুবিধার জন্য অ্যালোপ্যাথি বলতে বিজ্ঞান সম্মত

উন্নত চিকিৎসাকেই বুঝব। আর গেলোপ্যাথি বলতে বিকল্প চিকিৎসা সেবা কে বুঝব। এই দলটি কিন্তু অনেক বড়ো। আসুন সবাই কে চিনিয়ে দিই। তালিকা বেশ বড়সড়।

বিকল্প চিকিৎসা:

আয়ুর্বেদ (ভারত), হোমিওপ্যাথি(জার্মানি), আকুপাংচার(চীন), য়ুনানি(গ্রিস), নেচারোপ্যাথি(ইউরোপ), অ্যারোমাথেরাপি, রেইকি, সম্মোহন চিকিৎসা, যোগ, সংযোগ স্থাপন করা সঙ্গীত চিকিৎসা, ফেইথ হিলিং, অর্থোমলিকিউলার থেরাপি, ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট, মূত্র চিকিৎসা, বায়োফিডব্যাক, অস্টিয়োপ্যাথি, কিরোপ্রাকটিক, আকুপ্রেসার, আলেকজান্ডার টেকনিক, রলফিং, সিয়াৎসু, রিফ্লেকশোলজি, বিভিন্ন ধরনের ম্যাসাজ, থেরাপিউটিক টাচ, কি গং, চুম্বক চিকিৎসা, ফেং শুই, তাই কি, নানা ধরনের তড়িৎচুম্বকিয় ব্যবহার, সেলুলার থেরাপি (আইসোপ্যাথি থেকে), চিলেশন থেরাপি, অক্সিজেন থেরাপি, নানা ধরনের অপরীক্ষিত ক্যান্সার চিকিৎসা,অ্যানথ্রপোসফিক মেডিসিন,বায়োকেমিক, ফ্লাওয়ার রেমিডিজ, ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথি, আইসোপ্যাথি, লিথোথেরাপি, কালার ও লেসার আকুপাংচার,জল চিকিৎসা (হাইড্রো থেরাপি), থ্যালাসোথেরাপি, ইরিডোলজি, ডাউসিং, সাইয়োনিক চিকিৎসা, বায়োরেসোন্যান্স, কিনেসিওলজি, কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি, ভেগা টেষ্ট, ফ্রেনোলজি। বুঝতে পারলাম। বেশ

হাঁপিয়ে গেছেন। সেই জন্য সব নাম দিলাম না। আরো আছে।

প্রশ্ন হচ্ছে এতো চিকিৎসা কেন? মানুষ কে পূর্ণ সুস্থতা দেওয়ার দায়িত্ব কার। রাষ্ট্রের না ব্যক্তির নিজের? এরকম প্রশ্ন উঠেছে।

সবকটা বিকল্প চিকিৎসা আলোচনা সম্ভব নয়। আসুন কয়েকটি বেছে নিই।

আয়ুর্বেদ:

আয়ুর্বেদ বলতে আমরা আজকে যেটাকে জানি,সেটা শুধুমাত্র কতকগুলো গাছগাছড়া আর দেশীয় উপকরণ দিয়ে তৈরি একটা চিকিৎসা পদ্ধতি। সেই সঙ্গে রয়েছে নিদান--মানে অসুখটাকে কিভাবে নির্ণয় করবে, তা নিয়ে কিছু কথাবার্তা। আসল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের মতো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 'এনটিটি'। এটা হোলিস্টিকা। এতেও আছে এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, প্রিভেন্টিভ এন্ড স্যোসাল মেডিসিন, আছে 'আই', 'ইএনটি', সার্জারি বিভাগ। কিন্তু আয়ুর্বেদে উপযুক্ত লোক ছিল না। তাই আস্তে আস্তে অনেক ধারা লুপ্ত হয়ে যায়। কিছুটা সুশ্রুতের সার্জারিতে আর কিছু চরকের বইতে থাকে। তাকে বারবার সম্পাদনা করা হয়েছে। এটা আয়ুর্বেদের পূর্ণ পরিচয় নয়।

খ্রিষ্টের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে ভারতের সমস্ত বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে ছিল এই

আয়ুর্বেদ। প্রথমে এটি ছিল চরম বস্তুবাদী বিজ্ঞান। এখানে দৈবের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নি। ফলে এই মতবাদ প্রচারে এলে দৈবমহিমা কে মূলধন করে যারা ব্যবসা করেন, তাদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। কায়েমী স্বার্থবাদী লোক তাই এদের উপর চরম অত্যাচার নিপীড়ন নামিয়ে আনে। এদের নিগৃহীত করে, হত্যা করে, পুঁথিপত্র ধ্বংস করে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রচেষ্টা চলে। এরপরে যা কিছু বইপত্র ছিল তাদের একত্র করে তার মধ্যে দৈবের সংযুক্তি ঘটিয়ে তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার চেষ্টা করে একদল গবেষক। চরক-সুশ্রুত সংহিতার কথা আগেই বলেছি। তারফলে বিজ্ঞান ভিত্তিক একটা দর্শন ধ্বংস হয়ে ঈশ্বর ভিত্তিক একটি চিকিৎসা শাস্ত্রের দর্শন চালু হয়। সৃষ্টি হয় ত্রিদোষ তত্ত্বের(বায়ু, পিত্ত, কফ)। মানবশরীর পঞ্চভূতের সমাহার। যা আসলে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। আর অসুখের ব্যাখ্যা ছিল পঞ্চভূতে ভারসাম্যহীনতা। চিকিৎসকের কাজ ছিল এই পঞ্চভূতের ভারসাম্য রক্ষা। এখানে স্পষ্ট করে বলা ছিল রোগ সৃষ্টি ও নিরাময়ে দৈবের কোনো ভূমিকা নেই কিন্তু পরিবর্তিত তত্ত্বে এলো বায়ু, পিত্ত, কফ ভিত্তিক ত্রিদোষ তত্ত্ব। এখনো পর্যন্ত এই তত্ত্ব চালু আছে। যদিও তার কিছু রূপান্তর হয়েছে। এটাই কবিরাজি বলে পরিচিত। ও হিন্দি তে vaid.

দ্বিতীয় পর্ব।

ভেবেছিলাম পরে আলোচনা করবো। কিন্তু যে হারে প্রশ্ন আসছে তাতে বিষয়টাকে আগেই বলে নিচ্ছি।একটা কথা গেলোপ্যাথির লোকজন প্রায় আলোচনা করেন যে অ্যালোপ্যাথিতে বড্ড বেশি সাইড এফেক্ট আছে। আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সেবা তে এসব নেই।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র মনে পড়ে। মহাশয়, যাহার ক্রিয়াই নেই তাহার কিরুপ প্রতিক্রিয়া থাকিবে? যাইহোক আপনার/আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে অত নিশ্চিন্তে আয়ুর্বেদিক ওষুধ খেয়ে পেটে হাত বুলাতে বুলাতে ঢেকুর তোলার আগে জেনে নিন,২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জার্নাল অব আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন(JAMA) ও ২০০৫ সালে হেলথ কানাডা তে প্রকাশিত গবেষণা পত্র থেকে আয়ুর্বেদিক ওষুধ এর নমুনায় আর্সেনিক, সীসা, পারদ ও দস্তার মতো শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর ভারী ধাতুর উপস্থিতির কথা জানা গেছে।হেলথ কানাডা ১২টি আয়ুর্বেদিক ওষুধ না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে(Health Canada warns consumers not to use certain Ayurvedic medicine products,2005)। JAMA তে প্রকাশিত গবেষণা পত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রস্তুত ৭০টি পরীক্ষিত আয়ুর্বেদিক নমুনার মধ্যে ১৪টিতে বিপজ্জনক সীসা, পারদ ও আর্সেনিকের উপস্থিতির খবর প্রকাশিত হয়েছে (Saper et Al 2004:2868-73)। ২০০৮ সালে প্রকাশিত অন্য একটি গবেষণায় রক্তাল্পতা,স্নায়ুতন্ত্র ও

পরিপাকতন্ত্রের নানান সমস্যার পিছনে এইসব পন্য কে দায়ী করা হয়েছে (Dargan et Al 2008:463-74)।

আরেকটি অভিযোগ রয়েছে। আমি/আমরা নাকি পুঁজিবাদী সমাজের পেইড ব্লগার। এইসব বিরুদ্ধাচারণের জন্য আমাদের পয়সা দেওয়া হয়।এই প্রসঙ্গটি একদম শেষে আসব। এখন আলোচনা করলে ছন্দপতন ঘটে যাবে।

তো মূল প্রসঙ্গে যাই। আমাদের আলোচনা চলছিল আয়ুর্বেদ নিয়ে।

আগে যে অর্থে বায়ু বা পিত্ত বলা হতো, এখন সেটা পিত্ত বা বায়ু নাও হতে পারে। তিন হাজার বছর আগে পিত্তের মানে আজকে উদ্ধার সম্ভব নয়। কারণ সেই ট্রাডিশন অনুযায়ী আগামী তে কাজ হচ্ছে না। দুঃখের বিষয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাতে আপডেটিং টা হয়নি। মূল আলোচনার বিষয় হচ্ছে method.কোন method এ কি চর্চা হয়েছে সেটাই আসল। method মেনে চলেছে বলেই আধুনিক চিকিৎসা একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে আর মেথড মানেনি বলেই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা এক জায়গায় এসে থমকে গেছে। আজকে আমরা যেটা দেখছি এটা একটা অপভ্রংশ।

এই যে বিভিন্ন ধাতু আয়ুর্বেদিক ওষুধ এ পেলাম এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আসলে আয়ুর্বেদে এমন ঔষধ প্রয়োগ করা হতো অ্যাকিউট কেসে যেগুলো ভস্ম কিংবা ধাতু। ভস্ম হচ্ছে কয়েকটি টক্সিক ধাতু যেমন পারা, সোনা, রূপা।

এগুলো কে জারিত করা হতো। যেমন আর্সেনিক জারিত করলে বিষ নয়। কিন্তু বিজারিত রূপ বিষাক্ত।

আয়ুর্বেদ কিন্তু প্রথম চিন্তা করে যে শরীর মনকে সুস্থ রাখতে গেলে তার পরিবেশ,তার জীবন যাপন, তার আচার আচরণ এগুলো কেও যুক্তিশীল হতে হবে। আধুনিক চিকিৎসা যেটা আজ উপলব্ধি করতে পেরেছে।

তথ্য যখন আমার হাতে কম, তখন আমি যতই তত্ত্ব বানাই ততই ভুল হবে। সেই ভুলটাই আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে হয়েছে প্রথম দিকে। আধুনিক যুগেও হচ্ছে।

আয়ুর্বেদের বর্তমান চেহারা এক কথায় লজ্জাজনক। আমাদের দেশে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার গুণমান নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পাঁচখানা ল্যাবরেটরী ও রাজ্য সরকারের একটি করে ল্যাব রয়েছে। হয়তো সেখানে NMR নেই। কিন্তু AAS আছে HPLC, GC প্রত্যেক ল্যাবে আছে।এবার যদি আমি মনে করি, এক কোটি টাকা ব্যয়ে শুধুমাত্র কুমড়ো পাতা ও মূলোপাতা দিয়ে একটা বড়ি বানাবো এবং পাশে ১০৮টা গাছের নাম লিখে দেব, তাহলে সারা পৃথিবীর কোথাও কেউ বলবে না যে এতে কুমড়ো আর মূলা পাতা আছে বাকিগুলো নেই।

এই যে সমান্তরাল ভাবে আয়ুর্বেদিক ওষুধ এর ব্যবসা চলছে আর দাবি উঠছে রোগ সারছে এটা মারাত্মক খারাপ প্রবণতা।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা তে ব্যবহৃত সিঙ্কোনা গাছ থেকে কুইনাইন, উচ্চরক্তচাপে সর্পগন্ধা থেকে রেসারপিন,আফিম থেকে ব্যথার ওষুধ মরফিন আধুনিক চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু আয়ুর্বৈদিক নিয়মমেনে গাছের অবিকৃত নির্যাস ব্যবহার আজকের দিনে হয় না। কারণ উদ্ভিদের প্রাপ্ত নির্যাসে একাধিক উপাদান উপস্থিত থাকে যার একটি বা দুটি উপাদান কার্যকরী বাকি অপ্রয়োজনীয়। আয়ুর্বেদ এই কোন ভেষজের কোন উপাদানের কতখানি কোন রোগের জন্য ফলদায়ী তা সুনির্দিষ্ট ভাবে খতিয়ে দেখারও কোনো সিস্টেম নেই। এই সমস্ত কারণে এই প্রাচীন চিকিৎসা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

তৃতীয় পর্ব।

হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে কিছু বলা অত সহজ নয়। না একতরফা বিরোধিতা ভালো নয়। একথা অনস্বীকার্য যে অ্যালোপ্যাথি বনাম হোমিওপ্যাথি বিতর্ক বহুদিন ধরে চললেও মানুষের মধ্যে থেকে হোমিও চিকিৎসার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে চিড় ধরানো যায় নি। ১৯৮৪ সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে এদেশে ২.৭ লক্ষ আধুনিক চিকিৎসক, কবিরাজ ২ ৪ লক্ষ, হোমিওপ্যাথ, ১.১২ লক্ষ, ইউনানি ২৯ হাজার আর সিদ্ধা ১৮ হাজার। সাঁইত্রিশ বছর পর এই চিত্রটি কোথায় পৌঁছে গেছে সহজেই অনুমেয়। প্রশ্ন উঠবে এদের জীবন ও জীবিকারও। সেই হিসাবে এদেশে বর্তমানে জ্যোতিষ

পেশায় যুক্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে প্রায় দশ কোটি দাঁড়িয়েছে। কাজেই স্বীকৃতি দিতে গেলে তাঁরাও বঞ্চনার অভিযোগ তুলবে।

প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসাবিদ হিপোক্রেটিসের মত ছিল অসুস্থতা সারিয়ে তুলতে প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসকের কাজ। রোমান আমলের চিকিৎসক গ্যালেনের মত ছিল উল্টো -- প্রকৃতিকে জয় করাই কাজ।গ্যালেনের শিষ্যরা গড়ে তুললেন অ্যালোপ্যাথি ব্যবস্থা। অ্যালোর অর্থ ভিন্ন বা উল্টো, গ্রিক 'পেথস্' অর্থে দুঃখ, কষ্ট থেকে প্যাথি।

এটা ঠিক প্রথম দিকে অ্যালোপ্যাথির চিকিৎসার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে লিডেনের চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক হারমান বোরহাভ (১৬৬৮-১৭৩৮) বলতে বাধ্য হলেন যে একেবারে কোনো চিকিৎসা না থাকলেই মানব সমাজের কল্যাণ হত।

এমন সময়ে হ্যানিম্যান (১৭৫৫-১৮৪৩) হোমিপ্যাথি শুরু করলেন।'হোমো',হোমিওর অর্থ সদৃশ, like, similar)। এবং তিনিই সনাতনী চিকিৎসার নাম দিলেন অ্যালোপ্যাথি। ওনার সম্পূর্ণ নাম স্যামুয়েল ক্রিশ্চান হ্যানিমেন।ইনি তাঁর বিরাট সৃষ্টি The Organon প্রকাশ করেন ১৮১০ সালে। তাঁর মূল চিন্তা like cures like; Law of Similia: Similia similibus curantor। তাঁর মতে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনীশক্তি (spiritual life force) ব্যাহত হলে প্রকাশ পায় রোগ লক্ষণ।অসুখ হবার কারণ হলো আত্মার মতো যে

জীবনীশক্তি মানুষ কে (সুস্থতা-অসুস্থতায়) সঞ্জীবিত রাখে সেই ভাইটাল ফোর্সের গতিময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টতে।

Organ of medicine কি বলছে।

When a person fall ill,it is only this spiritual self-acting automatic vital force, everywhere present in his organism, that is primarily deranged by the dynamic influence upon it by a morbific agent inimical to life;

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অকল্পনীয় ক্ষুদ্রমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। হ্যানিম্যানের তত্ত্ব অনুযায়ী ঔষুধের মাত্রা যত কম হবে তার শক্তি ও কার্যকারিতা তত বেশি হবে। এরকম অচিন্তনীয় লঘুকরণকে(dilution) বোঝা যাবে এভাবে --- একফোঁটা ঔষধ প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে ভালোভাবে মিশিয়ে তার থেকে এক চামচ তুলে নিতে হবে। হ্যানিম্যান এর বিশ্বাস ছিল, ওষুধের বস্তুগত পরিমাণ যত কম হবে তার আধ্যাত্মিক নিরাময় শক্তি তত বেশি হবে। এবং তাঁর পরামর্শ ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লঘুকরণ বাড়াতে বাড়াতে এমনস্তরে নামিয়ে আনা উচিত যাতে দ্রবণের মধ্যে মূল পদার্থের পরিমাণ শূন্য হয়ে যায়। এটা নাকি নিরাময় ক্ষমতা কে চরম মাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। এই ধরনের ঔষধ খেয়ে ফলাফল পেতে পঞ্চাশ দিন ও লাগতে পারে।

তবে অচিরেই এই নিয়ে হোমিওপ্যাথি সমাজে ভাঙন ধরল। একদল বিশুদ্ধতাবাদী গোষ্ঠী, তাঁরা হ্যানিম্যান সাহেবকে অন্ধ

ভাবে অনুকরণ করলেন কিন্তু আরেকদল নিম্ন কার্যকরী গোষ্ঠী যারা মনে করতে শুরু করলেন যে ঔষধ এর লঘুদ্রবনে মূল পদার্থের সামান্যতম উপস্থিতি দরকার।

এবারে হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক। ল্যাক্রিমা ফিলিয়া (ইদানিং অব্যবহৃত) তৈরি হয় ক্রন্দনরত বালিকার অশ্রুর থেকে, ভোদোরের ঘাম থেকে মেফিটিস,জ্যান্ত ছারপোকা চটকে সাইমেক্স লেকচুলারিয়াস, মানুষের প্রস্রাব বা সাপের মল থেকে অ্যাসিডাম ইউরিকিম, অ্যাস্টেরিয়াস রুবেনস (গুঁড়ো করা তারামাছ), এমনকি ঘা বা খোষপাজরার রস থেকে ও অনেক ওষুধ তৈরি করা হয়।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা একটি মন্তব্য করেছে যে অনাক্রম্যকরণের অভিজ্ঞতাবাদী অনুশীলনের সঙ্গে ওপর ওপর মিল দেখা গেলেও হোমিওপ্যাথির যথার্থতার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। আবার এটাও শোনা যায় লঘুকরণ করতে করতে না কি ওষুধের পদার্থ বিলুপ্ত হয়ে পড়ে থাকে এক রহস্যময় রশ্মি, যা রোগ সারায়। সেন্টেসিম্যাল স্কেলে হ্যানিম্যান ৩০ ডাইলিউশন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। নব্যপন্থীরা অবশ্য লঘুকরণের উপর জোর কমালেন। ৩ থেকে ৬ ডাইলিউশনের বেশি আজকাল প্রায় কেউই ব্যবহার করেন না।

(চলবে)

তথ্য সূত্র:

বিজ্ঞান কে মুখোশ করে, মার্টিন গার্ডনার।

(উৎস মানুষ)

বিকল্প চিকিৎসা চিকিৎসার বিকল্প? সুব্রত রায়

(মুক্তচিন্তা পাবলিকেশন্)

আয়ুর্বেদ ও বিজ্ঞান,উৎস মানুষ।

হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান, উৎস মানুষ

Alternative medicine (2000), Encyclopedia of pseudo science.

"ধর্মে থাকুক বা না থাকুক, ভালো মানুষ ভালো এবং খারাপ মানুষ খারাপ কাজ করবেই। তবে, ভালো মানুষের দ্বারা খারাপ কাজ সেটাই ধর্ম করায়।"

-স্টিভেন ওয়াইন বার্গ (নোবেল লরেট, পদার্থবিজ্ঞান)

সালমান রুসদি ও পেশিশক্তির আস্ফালন

-গৌতম চক্রবর্তী

স্যাটানিক ভার্সেস পড়িনি। পড়ার মত বিদ্যাও নেই আমার। যে রুশদিকে ছুরি মেরেছে, তারও পড়া নয় এটা মোটামুটি নিশ্চিত। কলমের জবাব যখন পেশী শক্তি হয়, তখন বোঝা যায় যৌক্তিক অবস্থানের বিরুদ্ধে হেরে গিয়ে পেশী শক্তি দিয়ে তা থামানোর চেষ্টা। যা আরও বেশী করে সেই মতবাদকে প্রশ্নের মুখে দাড় করায়। কাল থেকে স্যাটানিক ভার্সেস নিশ্চিত ভাবে আরও অনেক মানুষ কিনেছেন। আরও বেশী মানুষ পিডিএফ ডাউনলোড করেছেন। আরও বেশী মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে বইটি। ইসলামিক মৌলবাদ সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু অমুসলিমদের কাছে নয়, মুসলমান পরিবার থেকে উঠে আসা নিরীহ সাধারণ মানুষ পর্যন্ত আতঙ্কিত। তাঁরা না পারছেন এর দায় নিতে, ধর্মীয় ভাবে না পারছেন এড়াতে। সম্ভবত সব থেকে বিব্রত আজ তাঁরা। তাঁদের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, বিশ্বাসের অলীক ইমারত যুক্তির স্রোতে বিপন্ন হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে বহুদিন ধরেই। দুনিয়ায় কোন মতবাদ বাইরের আক্রমণে বিলুপ্ত হয়না। বরং বিরুদ্ধ মতবাদ একজোট করে মানুষকে। মতবাদ বিলুপ্ত

হয় ভিতর থেকে, ভিতরের বিরোধিতার কারনে। ইসলামিক মৌলবাদে সব থেকে বেশী বিপন্ন ইসলাম নিজেই।

প্রথাগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে কয়টি ধর্ম আছে, ইসলাম সম্ভবত তাঁদের মধ্যে সবার আগে বিলুপ্ত হবে তার এই পেশীশক্তি প্রয়োগ করে মানুষের মুখ বন্ধ করার তাগিদের জন্য। আজকের দুনিয়ায় কেউ প্রশ্নের উপরে নয়, না কোন মানুষ না কোন মতবাদ। মানুষ সমালোচনা করবে, প্রশ্ন তুলবে বারবার; কিন্তু জোর করে মুখ বন্ধের চেষ্টা আদপে সেই প্রশ্নটাকেই বার বার তুলে আনবে।

সালনাম রুশদির উপর আক্রমনের তীব্র প্রতিবাদ রইল। যে মতবাদ কলমের উপর চাপাতিকে স্থান দেয়, তাদের আশু বিলুপ্তি কামনা করি। তীব্র ঘৃণা করি কলম থামানোর জন্য এই হিংস্র আক্রমণকে। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন রুশদি। সমস্ত ধর্মীয় আগ্রাসন প্রশ্নবিদ্ধ হোক, মানুষের বাক স্বাধীনতার উপর যে কোন আক্রমণ তীব্র ভাবে নিন্দিত হোক গোটা বিশ্বে। কলম চলুক সকল অসহিষ্ণু মতবাদের বিরুদ্ধে।

“যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাদের আমি ভয় পাই না। বরং যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে খুনখারাপি করে তাদের নিয়েই প্রকৃত ভয়।”

- তারা ফারেস

অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এর জাঁতাকল বাড়ছে

-শম্ভুনাথ চার্বাক

দুর্গা দুর্গা, সাবধানে যেও, এইরে পল্টুর মা এই সময়ই তোমার হাঁচি পেলো! একটু দাঁড়িয়ে যা বাবা। রিন্টু বাবা চিন্তা করিসনা তোর বাবা ঠিক সেরে উঠবেন, যে ধন্বন্তরী ডাক্তার অস্ত্রোপচার করবে তাঁর হাতে আমাদের এখানে অনেক রোগী সুস্থ হয়েছে। সত্য সত্য সত্য, দেখ টিকটিকি টক টক করে সত্য ঘোষণা করলো। বোনপো রিন্টু আর ওর যুক্তিবাদী বন্ধু এসেছে বর্ধমান দুর্গাপুর থেকে। চিনার পার্কে মাসি বাড়িতে উঠেছে বাবাকে নিয়ে অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে। মাসির কথা শুনে বেরোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লো। কিরে, থেমে গেলি কেনো? ঐযে মাসি দেখনা এক শালিক, দাঁড়াও আর একটা শালিক আসুক তারপর বেরবো। একটু পরেই আরো তিনটে শালিক একসাথে এল। ছেলেটি বেরোবে এমন সময় মাসি বললো, বাবা ভুলে গিয়েছিলাম একদম, গতকাল ঠাকুর বাড়ি গিয়ে এই ফুল বেলপাতা আর মাদুলিটা নিয়ে এসেছিলাম, এটা জামাইবাবুর হাতে বেঁধে দিস। রিন্টুর বন্ধুর মুখ সারাক্ষণ ভার হয়ে আছে এইসব দেখে; রিন্টুও বুঝছে সেটা। কিন্তু কিছুই করার ছিলনা বলে এই যুক্তিবাদী পরপোকারি বন্ধুকে নিয়ে। মাসি কি বলছো?অস্ত্রোপচারের আগে দেহের

সব কিছু খুলে নেবে না হলে ইনফেকশন হতে পারে। তাহলে বাবা, আচ্ছা জামাইবাবুর মাথায় ঠেকিয়ে জামাইবাবুর বিছানার নীচে রেখে দিস। এই তোর পায়ের কালো কারটা ঠিক মতো বাঁধ, খুলে যাবে যে। আচ্ছা মাসি, এবার চলি দেরী হয়ে যাবে। নিজেদের গাড়িতেই এসেছে এবং গাড়িতে উঠেই পায়ের কালো কার ঠিক করে নিল, গাড়ি নিয়ে অ্যাপোলো হাসপাতালের দিকে এগোচ্ছে। হঠাৎ করে একটা জোরে ব্রেক কষলো, একটা কালো বেড়াল দ্রুত গতিতে রাস্তা পার হলো। আর একটু হলেই দুর্ঘটনা ঘটতো। রিন্টু ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল; তারপর গাড়ি থেকে নেমে আকাশের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করল। রিন্টুরা ধনী মানুষ, রিন্টুর হাতের আটটা আঙুলেই জ্যোতিষের দেওয়া নিলা, পলা, গোমেদ, রুবি প্রভৃতির আঙটি। বুড়ো আঙ্গুলে পরা যায়না তাই পরেনি। ওর বন্ধুর মুখের অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি গাড়িতে এসে বসল।

এদিকে ওর হাসপাতালে পৌঁছতে দেরী হয়ে গেছে, ওর বাবাকে অস্ত্রোপচারের জন্য অ্যানা স্থিসিয়া দেওয়া হয়েছে, একটু পরেই অপারেশন রুমে নিয়ে যাবে। রিন্টু বাবার মাথায় মাদুলি –ফুল দুর্বা ঠেকিয়ে বিছানার নীচে রেখে দিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু ও স্টাফেরা এলেন পেশেন্ট কে অপারেশন রুমে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রিন্টু ডাক্তারবাবুকে দেখে বাবার অবস্থার খোঁজ নিয়ে ডাক্তারবাবুকে শুধলো, বাবা সেরে উঠবেনতো? ডাক্তারবাবু

বললেন, দেখুন আমরাতো শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করি, বাকিটা ওপরওয়ালার হাত। ঈশ্বরকে ডাকুন তিনিই আপনার বাবাকে সুস্থ রাখবেন। বন্ধুটি বলে উঠল আমরা পেশেন্ট কে আপনাদের ভরসায় এনেছি, ওপরওয়ালার ভরসায় নয়। রিন্টু বলল কি আজেবাজে বকছিস। বন্ধুটি বলল ওপরওয়ালার ভরসায় এতদূর এত দামী হাসপাতালে আনার দরকার কি? তোদের কথাতে ওপরওয়ালা সর্বত্র বিরাজমান ; দুর্গাপুরেও নিশ্চিত ওপরওয়ালা আছে? ডাক্তারবাবু বোধহয় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন; তারপর যুক্তিবাদী বন্ধুর দিকে এমন একটা তীর্যক দৃষ্টি হেনে অপারেশন রুমে চলে গেলেন। রিন্টু আকাশের দিকে তাকিয়ে অদৃশ্য ঈশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে বন্ধুকে নিয়ে রিসিপশানে এসে বসলো। সেখানে বিশাল টি ভী তে সাঁই বাবার বিভূতি দেওয়ার দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। এখন প্রতি হাসপাতালেই দেবদেবীর থানে ভরা। রিন্টুর বন্ধু এসব দেখে বলল এবার হাসপাতালে না নিয়ে মন্দির মসজিদ গির্জাতে নিয়েই চিকিৎসা করালে হয়। দুজনে নানান কথা আলোচনা করছিল প্রায় তিন ঘন্টা ধরে। মাঝে একবার হাসপাতালের ক্যান্টিন থেকে চা পান করে এসেছে। হঠাৎ রিন্টুর নামে ঘোষণা হলো, রিন্টুকে কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করতে বলছে। রিন্টু ওর বন্ধু ভয়ে ভয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তারবাবু ওদের বসতে বললেন এবং বললেন, আপনার বাবার অবস্থা খুব ক্রিটিকাল, ভেন্টিলেশানে দেওয়া

হয়েছে, ওনার কোভিড হয়ে গেছে ----আমরা সর্বোতভাবে চেষ্টাই করছি, তবে বলতে পারছি না। এখন বাঁচা মরা সব ওপরওয়ালার হাতে।

আপনি বলতেই পারেন সোস্যাল মিডিয়া, ফেসবুকে যা খুশী লেখা যায় বলে আপনি হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা সংস্কারে খোঁচাখুঁচি করছেন। আর এইসব সংস্কার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লিখলেই কি মানুষ কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের গহ্বর থেকে উঠে আসবে? শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা মৃত্যুভোজ তুলে দেবে, সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বর্জন করবে, জ্যোতিষবিদ্যা, গ্রহরত্ন, হস্তরেখা বিচার, মাদুলি কবচ জলপড়া ইত্যাদির ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা কমবে? না, আমরা এসব এক্কেবারেই ভাবিনা যে আমার ফেসবুকের লেখা দেখে সবাই কাল থেকে পূর্বজন্ম, পরলোক, হাঁচি, দু'শালিক, বেড়ালের রাস্তা কাটা, কবচ মাদুলি, কালো কার লাল সুতো সম্পর্কে আমার ফেসবুকের বন্ধুরা অবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। তবুও প্রচন্ড জলস্রোতের বিপক্ষে মাছেরা সাঁতার কাটে, জিওনার্দো ব্রুনোরা শয়তানদের আগুনে জ্যান্তো পোড়েন, চার্বাকেরা নির্মূল হয়ে যান ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের রোষে; গ্যালিলিওরা কারাগারে অবরুদ্ধ হয়ে জীবন দেন, সক্রেটিসেরা হেমলকে জীবন দেন।

সমাজের সমস্ত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং সংবেদনশীলতা একদিনে তৈরী হয়নি। হাজার হাজার বছর

ধরে প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভয় ভীতি অসহায়তা আদিম মানুষের মনোজগতে ধীরে ধীরে নানা অলৌকিক অবাস্তব কল্পনার সৃষ্টি করেছে। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বার্থান্বেষী ধীমান মানুষের প্রশ্রয়ে শাখা প্রশাখা শিকড় বাকড় ছড়িয়ে প্রসারিত হয়েছে মানুষের কোশে কোশে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধমনীতে ধমনীতে, অর্জন করেছে সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব। এবং মানুষের বেঁচে থাকার বাধাগুলির বিরুদ্ধে মানুষের অন্ধ আবেগ, ক্রোধ, ঘৃণা, আক্রোশকে প্রশমিত করতে কিছু মানুষ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে পুঁজি করে অবিজ্ঞানকে সচেতন ভাবে বিস্তার করে গেছে। তাই অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের অধ্যাপক ক্লাশে সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ ছাত্রদের পড়িয়ে গ্রহণের দিন নিরম্বু উপবাস করে গ্রহণের পরে কীর্ত্তনীয়াদের সাথে গঙ্গায় স্নানে যায় পবিত্র হতে, ডাক্তারবাবু নিজের দায়িত্ব কমিয়ে ঈশ্বরের ওপর দায়িত্ব দিয়ে দেন, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ণের অধ্যাপকেরা মারকিউরাস ক্লোরাইড, অ্যালুমিনিয়ামের পাতের সংযোগে উৎপন্ন আতর মেশানো ছাই বা বিভূতি নেওয়ার জন্য সাঁই বাবার আশ্রমে হুমড়ি খান।

আমাদের দেশের সুপ্রাচীন লোকায়ত বেদে বলা আছে --- “কায় শরীর অঞ্চতি রক্ষতি কবচ “---- অর্থাৎ শরীরকে যে রক্ষা করে সেই কবচ। যেমন শীতবস্ত্র শীতের কবচ। পরবর্তী শ্রেণি বিভক্ত জাতপাতে বিভক্ত সমাজকে নিজেদের

নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ধীমান শাসক পুরোহিত শ্রেণি সমাজকে অনশবিশ্বাস, কুসংস্কার ও বিভিন্ন আচারে মুড়িয়ে দেয়। কবচের অন্য অর্থ করে ---- ধাতুর খোলে দেবদেবীর নাম লেখা কাগজ এবং ফুল দুর্বা ঢুকিয়ে ধারণ করাকেই কবচ বলেন, এই কবচের মধ্যেকার বীজমন্ত্র জীবনকে রক্ষা করবে। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে আর্থিক সামাজিক নিরাপত্তাহীন, রোগ শোক, দুর্বিপাকে বিপর্যস্ত মানুষের দুর্বল মানসিকতাকে সাইকোথেরাপির সাহায্যে মোহাবিষ্ট করে ঐসব কবচ মাদুলি রত্ন বিকিকিনি করে লাভবান হন জ্যোতিষ বা রত্ন ব্যবসায়ীর মতো সমাজের গুটিকয় মানুষ আর সর্বসান্ত হয় অধিকাংশ দুর্বল মানুষ। জ্যোতিষেরা অপরের ভাগ্য ফেরান আর নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে বিজ্ঞাপন দেন খবরের কাগজে দূরদর্শনে। সমাজে নানান বাবাদের প্রাদুর্ভাভাব আগের তুলনায় বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। মানুষ যন্ত্রের প্রভাবে ক্রমশ নি:সঙ্গ একা হয়ে যাচ্ছে। টলমল সমাজে মানুষ সংঘবদ্ধতা থেকে একাকী হয়ে গেলে জ্যোতিষ ওঝা এবং বিভিন্ন বাবাদের মায়েদের প্রাদুর্ভাব আরো বাড়বে আগামীতে। চতুর শিল্পপতি ও ধনীরা দূরদর্শনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বামাখ্যাপা রামপ্রসাদ লোকনাথ রাসমণির মতো সিরিয়াল দূরদর্শনে আরও বাড়িয়ে দেবেন। এফএম এ কালী কথা কৃষ্ণ কথা শিব মাহাত্ম্য র প্রোগ্রাম আরও বাড়াবে। এগুলো ঢাল হিসেবে কাজ করবে।

আমার খাবারের থালায় প্রতিদিন একমুঠো করে ভাত কমে যাচ্ছে, বাবার কারখানা অফিস বন্ধ ছাঁটাই চলছে, অর্ধশিক্ষিত ভাইটা কর্মহীনতার অন্ধকারে নিভিয়ে ফেলছে উদ্ধত আলোক শিখার মতো যৌবনশক্তির মহা উত্তাপ, আমার যুবতী বোনটার নাকের কাছে রুমাল দুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শয়তান অন্ধকারের দেশে, আমার সন্তানের শিক্ষা, চিকিৎসা, স্ত্রীর রক্তহীন পান্ডুর মুখ, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত অসুস্থ পিতা মাতার দীর্ঘশ্বাস এবং নিরুচ্চারিত অস্তিত্ব, মুখের সামনে বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানা, ইংরাজীতে এম এ এবং বি এড পাশ সোনার পুরের শান্তনু মিস্ত্রির আত্মহত্যার খবরে, পিএসসি, এসএসসি তুলে দেওয়ার খবরে বা রাজ্যের সমস্ত চাকুরি 20-30 লক্ষ টাকাতে বিক্রির খবরে ক্রমে ক্রমে নিভে আসছে বিবর্ণ পৃথিবীর অপসৃয়মান আলো। - কী সীমাহীন অন্ধকার আর ক্রোধ, আমার ভালো অথবা খারাপ অবস্থার জন্য দায়ী নিয়ন্ত্রকগুলির ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সম্পূর্ণ অনিশ্চিয়তার জীবনের জন্য আমি কাকে দায়ী করবো?

সারাদিন টিভির পর্দায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, বামাখ্যাপা, সাইবাবা, সারদামণি, শ্রীরাম এবং জ্যোতিষেরা বশীকরণ মন্ত্র দিয়ে সব আয়ত্তে এনে দেবে, হনুমান চল্লিশা ব্রেসলেটের বিজ্ঞাপন মানুষকে দাবিয়ে রেখেছে। ঐতিহ্যের নামে

কুসংস্কার আর অজ্ঞতাকে মহিমান্বিত করে বিশাল দুঃখ আর ক্ষোভকে তাবিজ-কবজ, রত্ন, পাথর আর অদৃষ্টবাদের গোলকধাঁধায় হারিয়ে দিতে চায় --- আমি কি তাদের কাজের প্রতিবাদ করবো না?

“যে দেশের যুব সমাজ শুধু দেব ধর্মের পিছনে দৌড়াতে থাকে, তাদের জন্য আমি 'কাপুরুষ' শব্দটাই ব্যবহার করা উচিৎ মনে করি। এরা নিজের হাত-পা চালাতে পারে না বলেই দেব-দেবীর সামনে হাত জোড় করে থাকে। এমন যুব সমাজের হাতে দেশের ভার গেলে সেখানে কিছুই ভাল হওয়া সম্ভব নয়।”

- ভগৎ সিং

গুরুত্ব বুঝেই বিদ্যাসাগর সক্রিয় নাট্যকর্মী হয়েছিলেন

-তপন চক্রবর্তী

বিদ্যাসাগর মানেই বর্ণপরিচয়, বিধবাবিবাহ, নারী শিক্ষা, দয়ার সাগর। কিন্তু বিদ্যাসাগর মানে সেকালের রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার একথা সর্বজন বিদিত নয়। আসলে থিয়েটারের ক্ষেত্রে সব সময়েই সব দেশেই একটি ব্যাপার খুবই স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে, সেটি হল একজন উচ্চমানের অভিনয় শিল্পী বা নাট্যকার যে পরিমান জনপ্রিয়তা আর পরিচিতি আদায় করেছেন, যত সহজে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিদগ্ধ পণ্ডিতজনের এক ব্যাপক অংশের ভাবনা চিন্তায় আগ্রহের সৃষ্টি করেছেন, নিজেকেই একজন সংগঠক মধ্য আলো আঙ্গিক শিল্পীর পক্ষে অতটা সম্ভব হয়নি।

আজ আমরা পরপর দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা থেকে গণ প্রতিরোধের সম্পূরক নাট্য আন্দোলনের কার্যকর প্রভাবের কথা জেনেছি। কিন্তু সেই উনিশ শতকের গোড়ায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পর্বেই। বিদ্যাসাগর নিজেরই বিধবা বিবাহ প্রচলনের ও বহুবিবাহ রোধের আন্দোলনকে বঙ্গরঙ্গ মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত করার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতে আশ্চর্য লাগে, ভালও লাগে। তিনিও কি সেই রোপনপর্বে

বার্ডোন্ট রেট বা গার্সিয়া সোরকার মত অনুভব করেছিলেন "দেশের মানস গঠনে থিয়েটার এক অত্যন্ত উপযোগী ও অভিব্যক্তিক অস্ত্র, যার পরিমাপে দেশের উত্থান বা পতনের বার্তা পাওয়া যায়" বা যে জাতি তার থিয়েটারকে সাহায্য করে না, তার মেরুদন্ড সোজা হয়না" ঠিক যেমন "যে থিয়েটার তার সমাজ স্পন্দন, তার ইতিহাসের স্নায়ুস্পন্দন অনুভব করেনা, তার থিয়েটার নামের মুখ থাকে না।" আমরা জানি, বাংলা থিয়েটার ১৮৫৭-৭৬ সালের নাট্য নিয়ন্ত্রন বিধি চালু করেছিল। তখন থিয়েটার হলে ঢুকে ব্রিটিশ আমলা পুলিশ অমৃতলাল ও উপেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরেছিল। নাট্যাভিনয়ের জন্য শিল্পী নাট্যকারদের কারাবরণ এই প্রথম এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

অতঃপর বাংলা থিয়েটার চলে গেল। যুক্তিবাদী বা র‍্যাশনাল সমাজসেবীদের হাত থেকে ভক্তিবাদী হিন্দু পৌরানিক পুনরুজ্জীবনকামীদের হাতে। এল বঙ্কিমচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের হিন্দু জাতীয়তাবাদের যুগ। ঠিক এই সময়েই রামকৃষ্ণ স্টারে চৈতন্যলীলা দেখতে এসে বলেছিলেন "তোদের চৈতনা হোক, থ্যাটারে লোক শিক্ষে হয়রে।" অথচ বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, মানুষের মনে ঐহিক জীবনবাদী যুক্তিবোধের উন্মেষ হোক থিয়েটারের মাধ্যমে। সমকালের ঐতিহাসিক ঘটনা নীল বিদ্রোহ-প্রসুত দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" যা বাংলা থিয়েটারের প্রথম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি নাটক,

যাকে উৎসাহিত করতে বিদ্যাসাগর সক্রিয়ভাবে নাট্যকার্যে যুক্ত হয়েছিলেন। তার সময়ে ইংরেজ শাসনের হাত ধরে এসেছে পাশ্চাত্য শিল্প-বাণিজ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, স্কুল-কলেজ, এসেছে সেক্সপিয়ার, ভোলতেয়ার, লক, বেকন প্রমুখ আলোকপ্রাপ্ত স্রষ্টা ও দার্শনিকদের ভাবাদর্শ, যা আমাদের জাতীয় জীবনকে যুগসঞ্চিত ধর্মীয় শাস্ত্রবিধির বন্ধন থেকে মধ্যযুগ অন্ধকার থেকে মুক্তির রাস্তা দেখাতে পারে। সঙ্গে পেয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, শিযা রামনারায়ণ তর্কররত্নকে যাঁরা মূলত নাটককার। তখনকার অক্ষম অনুকরনে বানানো থিয়েটারের মাধ্যমে তাদের লিখিত শ্রব্য রচনাকে অভি বা সামনে নীত করতে, অর্থাৎ নাটকে সমস্যা ও বার্তা মানুষের কাছে পৌছাতে, কলোনী প্রসাসন, শ্রেণীকক্ষ, শাস্ত্র দিয়েই শাসকার মণ্ডলের বিচার বিতর্কের মধ্যেই তিনি ছুটেছেন নাট্য সংগঠনে, নাটকের মহড়া কক্ষে। তখনকার নাগরিকদের মান এই নতুন বস্তুবাদী ভাবাদর্শ সঞ্চার করার তাগিদ নিয়ে। তখনকার সামাজিক সমস্যা ও থিয়েটারের পারস্পরিক প্রভাব প্রতিফলনের উপযোগিতা বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন। থিয়েটার সমাজ প্রগতি সহ্যাক শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম শুধু বিশ্বাস নয়, কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই উন্নত মনন প্রয়াস বিস্ময়কর।

যে বছর মহাবিদ্রোহ ঘটল, সেই ১৮৫৭ সালেই কোলকাতার রামজয় বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' এর মত বিস্ফোরক সমাজ চেতনার নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। রামনারায়ন ছিলেন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের ছাত্র। বিধবা-বিবাহ, বহু বিবাহ বিষয়ক যুক্তি তর্কে গুরুর শাস্ত্র দিলেনই, শাকুকে নাকচ করার তীক্ষ্ণ পুনর্মূল্যায়নে উৎসাহিত হয়ে, এমনকি সংলাপে সেই সব যুক্তিকে নাট্যরসে চুবিয়ে রামনারায়ন কৌলিন্য প্রথার বর্বরতা ও মুখোশ উন্মোচিত করেন তাঁর প্রহসন নাটকে। গৌরদাস বসাকের স্মৃতিকথাতে ও সংবাদ প্রভাকরের প্রতিবেদনে জানা গেছে, এই অভিনয়ের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করেছেন এবং অভিনয় দখেছেন। একই সময় কালে বেলগাছিয়ার জমিদার প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রাসাদ প্রাঙ্গনে যে নাট্যশালা তৈরী করে ছিলেন, তাতে মঞ্চস্থ হওয়ার আগে রামনারায়নের অনুদিত 'রত্নাবলীর মহড়ায় বিদ্যাসাগর পরিচালনার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটক (১৮৫৭)। এটি মঞ্চস্থ হয়েছিল চিৎপুরের রামগোপাল মল্লিকের বাড়ীতে তৈরী মেট্রোপলিটান থিয়েটারে। এই ঘটনাতে কেশবচন্দ্র সেনের সাথে বিদ্যাসাগরও সহযোগী ছিলেন। এই নাটকের

দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষা অনেকটাই বিদ্যাসাগরের নাট্য ভাবনার প্রভাব পড়েছে। পরে উমেশচন্দ্র সীতার বনবাস' অবলম্বনে নাটক লেখেন। বোঝা যায় দুজনার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। “বিধাব বিবাহ"। নাটকের চতুর্থ সংস্করণে ভদ্র চরিত্রের সংলাপে ক্রিয়ার সাধুরূপ বাদ দিয়ে। বিদ্যাসাগরের পরামর্শে হয়েছিল করতেছেন, বলতেছেন ইত্যাদি।

লক্ষ্যকরার মতো, তখনকার ধনী জমিদারদের প্রসাদে মঞ্চের সেই সেই নাটকাভিনয়ের প্রতি বিদ্যাসাগরের আকর্ষণ ও দায়বদ্ধতা ছিল, যেগুলিতে প্রধানত মধুসুদন, দীনবন্ধু, রামনারায়ণের মত সেকালের প্রেক্ষিতে প্রগতিশীল সাহসী নাটককারের রচনা মঞ্চস্থ হয়েছিল। রাজা যতীন্দ্রমোহনের পাথুরায়া ঘাটার নাট্যমঞ্চ পরিচালনার জন্য যে কমিটি হয়েছিল, তাতে কবি নাটককার মধুসুদন অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরও স্বাগত হয়ে ছিলেন। রাজবাড়ীর মঞ্চ টানাটানি নেই। বিদ্যাসাগর পণ্ডিত হলেও ধনী ছিলেন না। তাই এটাই ঘটনা, নাটক নির্বাচনে, পরিমার্জনায় এবং চরিত্রানুগ অভিনেতা নির্বাচনে তিনি কেবল উৎসাহী ছিলেন বলে কমিটি সদস্য করা হয়নি, যোগাও ছিলেন। বিদ্যাসাগর সমকালের সামাজিক নাটক ও থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর আন্দোলনকে

কতটা মেলাতে পেরেছিলেন বোঝা যায়, তখনকার বহু বিবাহ বিষ্যাক নাটকগুলির প্রযোজনার। তিনি যে যুক্তিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করে রক্ষণশীল সমাজকে নাড়িয়ে দিতেন সেই সমনোর নাট্য সংলাপ তার প্রয়োগ হয়েছে, "বিশ্ববা সুখের দশা' নাটকে যিনি দর্শকাসনে বসে শুনেছেন “সত্যি দিদি শুনে এলুন, চ আমারো বাবাকে বলে তাই করি। আমি সব কথা শুনে এসেছি। কলকাতায় নাকি কে একজন বিধবার বের পাঁজিপুতি করেছেন।" কৌলিন্য প্রধার ছোবলে বাল্য বিবাহ, বুড়ো মরতে দুই বোন বাবার ঘরে চলে এসেছে বিধবা হয়ে। এবার আন্দোলনের ঢেউ লেগেছে তাদের যৌবনে স্বপ্নে। দীনবন্ধুর "বিয়ে পাগলা বুড়ো" নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে গৌরমনির সংলাপে শুনলেন “দিদি, ভাল খেতে ভাল করে সংসার ধম্ম করে কার না সাধ যায়? মা বাপ যদি একাদশীর জ্বালা বুঝতেন, তাহলে এতদিনে বিধবা-বিবাহ চলতো। দেখ দিদি, এসব পরমেশ্বর করেননি, মানুষে করেছে। তিনি যদি করেন, তবে আমাদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেত। বিদ্যাসাগর এই সময়েই জোড়াসাঁকো নাটা শালার পরিচালন কমিটির এবং পরবর্তী কালে বেঙ্গল থিয়েটারের উপদেষ্টা পর্যদের সদস্য হয়েছিলেন। ১৮৬৫ সালে “ইন্ডিয়ান মিরার" পত্রিকায় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দেন। গ্রামে জমিদারদের অত্যাচার বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নাটক লেখককে ২০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, যার অন্যতম বিচারক ছিলেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের অভিনব সৃষ্টি কালিদাস, ভবভূতি এবং সেক্সপিয়ারের কমেডি অবলম্বনে গদ্য ভাষায় নাট্যধর্মী আখ্যান রচনা, কালিদাসের শকুন্তলা (১৮৫০), ভবভূতির উত্তর রামচরিত অবলম্বনে সীতার বনবাস (১৮৬০) এবং সেক্সপিয়ারের কমেডি অব এররস্ অবলম্বনে ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) রচনাগুলি যেন তাঁর নাটাবোধের পরীক্ষাগার, বিশেষ করে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে আখ্যানবর্ণিত চরিত্রগুলির সংলাপ, পরবর্তী প্রজন্মের নাট্যকারদের কাছে দৃষ্টান্তমূলক বলা যেতেই পারে, তাছাড়া ঘটনার ঘনঘটা বা বহিরঙ্গ থেকে নাট্য চরিত্রকে অন্তলোকে সংঘাতময় করে তোলার প্রতি তার মনোযোগ, বিভিন্ন মুড সৃষ্টিতে ও আবরনে নিয়ন্ত্রনে সেকালের প্রেক্ষিতে তাঁর পরিমিত বোধ অবাক করার মত।

একটি কথা স্মরণে রাখা দরকার। তা হল, সামাজিক আন্দোলন যেমন নাটকে ও মঞ্চে এসেছিল, তেমনি নাটক ও তার অভিনয় ও যে সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করে, তার নজির রামনারায়নের কৌলিন্য প্রথা ও বাল্যবিবাহ বিরোধী নাটকাভিনয়। কারন তাঁর নাটকের জন্ম কোন পূর্ব ঘটিত আন্দোলনের নাড়া খেয়ে জানি। গুরুর শাস্ত্র দিয়েই শান্ত বিচারের মুক্তি তর্কের প্রেরনায় এবং গরুরই প্রত্যক্ষ সহচর্যে তৈরী হয়েছিল সেই অভূতপূর্ব বাংলা প্রহসন নাটক,

রংপুরের জমিদার কালীচরণ চৌধুরি সম্বাদ ভাস্কর বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন "কৌলিদাপ্রথার কারণে নিঃবেশিত বঙ্গীয় কামিনীদের দুর্দশা নিয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করিবেন, তিনি ৫০ টাকা পুরস্কার পাইবেন, রামনারায়নের "কুলীন সর্বস্ব" নাটকই হয়েছিল প্রথম। এবং বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থাপনায় কলকাতায় ও চুঁচুড়ায় পরপর অভিনয় হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় থেকেই এদেশের রেনেসাস আন্দোলনের শুরু বলা চলে, ইউরোপের বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধ্যান ধারনা ও চিন্তা ভাবনাগুলিকে ধর্মের মূল সুরটির সঙ্গে মিলিয়ে ধর্মীয় সংস্কারের পথেই তিনি এদেশে রেনেসাঁস আন্দোলনের জন্ম দেন। ফলে এদেশের রেনেসাঁস আন্দোলন রিলিজিয়াস ল এর (ধর্মীয় সংস্কার) পথ ধরে ধরে এগোতে থাকে। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভ্যুত্থান রেনেসাঁস আন্দোলনে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা এবং যতদূর মনে হয় বিদ্যাসাগরই প্রথম ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় সংস্কারের পথে রেনেসাস আন্দোলনের মধ্যে একটা ব্রেক ঘটালেন। তিনিই প্রথম এদেশে যতদূর সম্ভব মানবতাবাদী আন্দোলন কে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চাইলেন। বিদ্বজনেরা তাই একমত যে তিনিই তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ পরিবেশে একজন খাঁটি হিউম্যানিষ্ট, অত্যন্ত আধুনিক মানুষ, এবং ভারতবর্ষের নবজাগরনের অগ্রদূত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে অনেক গবেষণা আলাপ আলোচনা হয়েছে হচ্ছে। কিন্তু তিনি

সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করেই এক জন যথার্থ ও সক্রিয় নাট্যকর্মী হয়ে বাংলা থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত নয়। এ দায় আমাদের নাট্য কর্মীদেরই নিতে হবে। বাংলা থিয়েটারে তাঁর অমরকীর্তি স্মরণ করে, থিয়েটারের গুরুত্ব বুঝে, থিয়েটারে নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হতে হবে।

“মানুষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ঈশ্বরের ছিল না, কিন্তু মানুষ যখনই চেয়েছে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে প্রতিটি মোড়ে।”

-পেরিয়ার ই.ভি. রামাস্বামি

আস্তিক-নাস্তিক: কিছু প্রশ্নোত্তর

-দিবাকর মন্ডল

অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষদের আস্তিক বা ঈশ্বরশ্বরবাদী দাবি করতে দেখেছো?

উত্তরঃ হ্যাঁ

আস্তিকরা কি বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং প্রযুক্তি কে অস্বীকার করে?

উত্তরঃ হ্যাঁ (ওদের দাবি সব আদিশক্তি বা ভগবান করেছেন)

আস্তিকরা কি কোন তথ্য মানুষকে বিশ্বাস করে নিতে বলে?

উত্তরঃ হ্যাঁ

আস্তিকরা কি কোন কাল্পনিক ঘটনার তথ্য বিবরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করে?

উত্তর - না।

আস্তিক দেশগুলো কি উন্নত?

উত্তরঃ না(কিছু অনুন্নত এবং কিছু উন্নয়নশীল)

ঈশ্বর বা ভুত কি আস্তিকদের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

আস্তিকরা কি ধর্মগ্রন্থ গুলি পড়াশোনা করে?

উত্তরঃ বেশিরভাগই ধর্মগ্রন্থ পড়াশোনা করে না অন্যের ভুল ব্যাখ্যা নিয়ে মাতামাতি করে। পড়াশোনা না করে, শিক্ষিত না হয়ে, বিজ্ঞান মনস্ক না হয়ে কি আস্তিক হওয়া সম্ভব?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

আস্তিকদের ক্রিয়া-কলাপ এর ফলে কি সমাজের সকল শ্রেণীর উন্নতি হয়?

উত্তরঃ না। একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের উন্নতি হয়।

আস্তিকদের কর্মকান্ডের ফলে কি মানুষের জীবনহানি ঘটেছে?

উত্তর হ্যাঁ। নরবলি, সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, এবং ডাইনি প্রথার মত বহু ঘটনায় বহু মানুষের জীবন গিয়েছে।

আস্তিকদের যাগ-যজ্ঞ,পূজা এসবের ফলে দেশের জনগণের, খেলাধুলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক দিক গুলিতে দেশের কি উন্নতি হয়েছে?

উত্তর- না।

সকল আস্তিকের ঈশ্বর কি এক?

উত্তর- না।

সকল আস্তিক দের রীতিনীতি কি এক?

উত্তর- না।

আস্তিকদের মতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল প্রকার মানুষকে কি সমানাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়?

উত্তর- না।

অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষদের নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী দাবি করতে দেখেছো?

উত্তর - না।

পার্ট-২

নাস্তিকরা কি বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং প্রযুক্তি কে অস্বীকার করে?

উত্তর - না।

নাস্তিকরা কি কোন তথ্য মানুষকে বিশ্বাস করে নিতে বলে?

উত্তর - না।

নাস্তিকরা কি কোন কাল্পনিক ঘটনার তথ্য বিবরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করে?

উত্তর - হ্যাঁ।

পৃথিবীতে নাস্তিকদের সংখ্যা কত শতাংশ?

৭% সমগ্র পৃথিবীতে

যার মধ্যে China - 91%

Japan - 87%

Sweden - 78%

Czech Republic - 76%

United Kingdom - 73%

Belgium - 72%

Estonia - 72%

Norway - 70%

Australia - 69%

Denmark - 68% মানুষ নাস্তিক এবং নিরীশ্বরবাদী।

সরকারি ভাবে প্রথম নাস্তিকদের দেশ কোনটি?

উত্তর - আলবেনিয়া (১৯৭৬)

নাস্তিক দেশগুলো কি উন্নত?

উত্তরঃ হ্যাঁ

ঈশ্বর বা ভুত কি নাস্তিকদের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরঃ না।

নাস্তিকরা কি ধর্মগ্রন্থ গুলি পড়াশোনা করে?

উত্তরঃ হ্যাঁ

পড়াশোনা না করে, শিক্ষিত না হয়ে, বিজ্ঞান মনস্ক না হয়ে কি নাস্তিক হওয়া সম্ভব?

উত্তরঃ না।

নাস্তিকদের ক্রিয়া-কলাপ এর ফলে কি সমাজের সকল শ্রেণীর উন্নতি হয়?

উত্তরঃ হ্যাঁ। মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক এবং বাস্তববাদী করে তোলা হয়।

নাস্তিকদের কর্মকান্ডের ফলে কি মানুষের জীবনহানি ঘটেছে?

উত্তর - না। উল্টে আস্তিকদের হাতে অনেকেই আহত এবং নিহত হয়েছেন।

নাস্তিকদের মতামতের ফলে দেশের জনগণের, খেলাধুলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক দিক গুলিতে দেশের কি উন্নতি হয়েছে?

উত্তর- হ্যাঁ।

সকল নাস্তিক দের রীতিনীতি কি এক?

উত্তর- হ্যাঁ সকলেই তথ্য প্রমাণ ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণে বিশ্বাসী।

নাস্তিকদের মতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল প্রকার মানুষকে কি সমানাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়?

উত্তর- হ্যাঁ।

lt. Nabin ch. Mondal

Pramanik para, Falta.. S 24 pgs

সাপ কি দুধ-কলা খায়?

- অদিতি প্রকৃতি কন্যা

আজ অনেকেই হয়তো সাপের জন্য দুধকলা দিতে যাবেন মন্দিরে বা সাপুড়ের বাড়িতে, আপনার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই! কিন্তু সত্যি কি সাপ দুধকলা খায়? সেই নিয়েই কয়েকটি কথা বলছি।

প্রথমত বলে রাখি, সাপ সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত শীতল রক্তের মাংসাশী প্রাণী, তার খাদ্য হল পোকামাকড়, টিকটিকি, ব্যাঙ,পাখি, ছোট ও মাঝারি আকারের স্তন্যপায়ী, এবং অন্যান্য সাপ। আর যেহেতু এরা স্তন্যপায়ী নয় জন্মথেকেই মায়ের দুধ খেয়ে এরা বড়ো হয় না তাই এদের জন্মের পর থেকেই শিকার করে বেঁচে থাকতে হয়। তাছাড়া সাপ ল্যাকটেজ ইনটলারেন্ট। ল্যাকটেজ কি? সাধারণ ভাবে বললে এই উৎসেচক শরীরে না থাকলে দুগ্ধজাতীয় খাবার হজম হয় না। সাপের পক্ষে দুধ হজম করা অসম্ভব! দুধ সাপের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর! দুধ খেলে সাপের শরীরে নানা সমস্যা থেকে শুরু করে সাপের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

বিশেষ করে গ্রামের দিকে অনেকে দাবি করেন নাকি নিজে চোখে দেখেছেন, সাপ গরুর পা পেঁচিয়ে গরুর ওলান এ মুখ লাগিয়ে দুধ চুষে খাচ্ছে! গরুর ওলান থেকে দুধ টেনে চুষে খেতে হলে একটি শক্ত জিভ থাকা দরকার। সাপের

জিভ দুর্বল ও দু-ভাগে বিভক্ত যার ফলে সাপের দুধ খাওয়া অসম্ভব।

আচ্ছা তাহলে গরুর পা পেঁচিয়ে ধরে কেন? অনেক সময় সাপ ইঁদুরের খোঁজে গোয়াল ঘরে ঢুকে পরে তা দেখে গরু ভয় পেয়ে লাফালাফি করে এবং সেই দেখে সাপও ভয় পেয়ে পা জড়িয়ে ধরতে পারে। এই ঘটনা খুবই কম চোখে পরে! বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাপ ভয়ে পালিয়ে যায়। তাহলে গরুর ওলান ফুলে থাকে কেন? বা শক্ত হয়ে কি করে? আমরা তো ভাবি সাপ দুধ খেয়েছে তাই ওরকম হয়!
আপনার ভাবার স্বাধীনতা আছে আপনি যা খুশি ভেবে নিতে পারেন তাতে সত্য পরিবর্তন হয় না। ওটা গরুর একটা রোগ যার নাম ম্যাস্টাইটিস বা ওলান ফোলা স্থানীয় ভাবে ওলান পাকা রোগ বলে। কেন এই রোগ হয়? আমি পশু চিকিৎসক নই, আমার কাছে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া আপনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। তবে সাধারণ বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে বলতে পারি বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস, মাইকোপ্লাজমা ও ভাইরাস এর জন্য হয়।

আচ্ছা, নিজের চোখে নাগপঞ্চমীতে দেখলাম যে সাপ বাটি থেকে দুধ পান করছে! তাহলে সেটা কি? প্রথমেই বলেছি সাপ দুধ খায় না। সাপুরেরা নাগ পঞ্চমীর একসপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে সাপকে জল খেতে দেন না ফলে সাপ

তৃষ্ণার্ত হয়ে পরে। নাগ পঞ্চমীতে সাপ বের করে সামনে দুধের বাটি ধরা হয় তৃষ্ণার্ত সাপ তৃষ্ণা মেটাতে সেই দুধ পান করে নেয়! সে সময় দুধের বদলে কোকোকলা রাখলেও সাপ তৃষ্ণার জন্য খেতে বাধ্য হবে। তাহলে সাপুড়ে রা এই কাজ করে কেন? সাপ ইঁদুর বা ডিম খায় বললে সাপুড়েকে কেউ দক্ষিনা দেবে না। ধর্মীয় বিশ্বাস কে হাতিয়ার করেই এই অমানবিক ধান্দাবাজি বহুকাল থেকে চলে আসছে। তাহলে কি সাপ জল পান করে না? হ্যা সাপ বেঁচে থাকার জন্য জল পান করে।

এখুনি যে বললেন সাপ চুষে কিছু খেতে পারে না! হ্যাঁ, সাপ গরুর ওলান থেকে দুধ চুষে খেতে পারে না। জলও চুষে পান করতে পারে না। জল চিবিয়ে পান করে। আর কলা? কলাও খায় না! কলা খেলে গাছে একটাও কলা থাকতো না সব সাপেরা খেয়ে নিতো। সাপেরা ফল খায় না ওরা মাংসাশী! এইবার আপনি বলুন অবলা প্রাণীদের উপর অত্যাচার আর কতদিন করবেন? সাপ মাটির হলে পুজো করেন আর জ্যান্ত হলে পুড়িয়ে মারেন কেন?

তাই বলছি, এই কুসংস্কারগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। চোখের সামনে সাপুড়েদের এইসব অমানবিক কাজ দেখলে তাতে বাধা দিন। বন দফতর বা লোকাল থানায় খবর দিন।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়: বিজ্ঞানী থেকে সমাজকর্মী

-পার্থ সারথী চন্দ্র

বাঙালি জাতিকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখালেন তিনি। বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে তিনিই খুঁজে বের করলেন রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

আপনি ‘বেঙ্গল কেমিক্যালস’ এর ওষুধের নাম জানেন? এ কালের অনেকেই হয়তো বলবেন, ওসব বেঙ্গল-ফেঙ্গল এখন চলে না। মডার্ন মেডিসিনের যুগ। 'ভারতীয় রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় স্থপয়িতা', 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড' ও তার প্রতিষ্ঠাতা রসায়নবিদ ও বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নাম হয়তো এখন খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই জানেন। স্বাদেশিকতা বোধ তো দূর অস্ত। আশ্চর্যের বিষয় হল প্রফুল্ল রায়ের জন্মদিনটা ২ আগষ্ট কি না কনফার্ম হবার জন্য তিনটে বাংলা ক্যালেন্ডার ও দুটো ইংরেজি ক্যালেন্ডার দেখতে গিয়ে অবাক হলাম কোথাও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের জন্মদিনের উল্লেখ না দেখে। অথচ কত বাবা, ক্ষ্যাপা প্রমুখের জন্মদিন, ছটপুজো, কৌমুদী পুর্নিমা এ সবেরই উল্লেখ আছে। নেই শুধু স্যার পি সি রায়ের নাম।

বাঙালির এই অধঃপতিত অবস্থার কথা শতবর্ষাধিক আগেই লিখে গেছেন তাঁর 'অন্ন সমস্যা ও বাঙ্গালীর নিশ্চেষ্টতা' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ১৮৬১ সালে জন্মেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালির মনন থেকে মুছে গেছেন। অথচ তিনি বার বার 'ডিগ্রিপ্রিয়,চাকরি প্রিয় বাঙালিকে' 'বিলাসের আরামশয্যা' থেকে জাগাবার চেস্টা করে গেছেন, তাদের দোষ ত্রুটি শুধরে নিতে পথনির্দেশ করেছেন। বাঙালি 'আলস্যের নিদ্রায় সুখের স্বপ্ন দেখে', 'বুদ্ধির অহংকারে অন্ধ হইয়া' জীবন সংগ্রামে ফাঁকি দেয়। ফলে 'বাঙালি সকল দিকের সকল ক্ষেত্র হইতে পরাজিত হইয়া পশ্চাদপদ হইতেছে'।

তিনি কেবল একজন অসামান্য বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি একাধারে একজন শিক্ষক, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ ও কবিও ছিলেন। শুধুই নীরস বিজ্ঞানশিক্ষা নয়, বরং সমগ্র বাঙালি জাতিকে অন্তর থেকে বিজ্ঞানমনস্ক তথা বিজ্ঞানচেতনা সম্পন্ন করে তোলাই ছিল প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আজীবনের সাধনা। বই থেকে পড়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিবর্তে ব্যবহারিক এবং ফলিত বিজ্ঞানের প্রসারে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রকল্পে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ব্যবসা-বিমুখ বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ‘বেঙ্গল কেমিক্যালস’ প্রতিষ্ঠা বাঙালিকে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

হরিশ্চন্দ্র রায়। ভদ্রলোকের জমিদারি তখন পড়তির দিকে। বাড়িতে পাওনাদারদের নিয়মিত কড়া নাড়া। স্ত্রী ভুবনমোহিনীদেবী অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে নিজের গয়নার টাকায় কেনা জমিদারির তালুক বিক্রির কাগজে সই করছেন। তাঁদের কলকাতার বাসা উঠে গেল। ফিরলেন খুলনার গাঁয়ে। ছেলেরা উঠলেন হস্টেলে। সেজো ছেলের জীবনে এই দৃশ্যটি মনে থেকে গেল। কিছু দিন পরে সেই ছেলেই উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতের পথে রওনা দিতে উদ্যোগী হলেন। যাওয়ার আগে মা'কে বললেন, 'জীবনে সাফল্য লাভ করলে, প্রথমেই সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও বাড়ির সংস্কার করব।'

সে কাজ বেশ কিছুটা করেওছিলেন। কিন্তু বাড়ির তুলনায় বাইরের জগৎ তাঁকে যে বেশি টানে। সেই টান আর দেশের কাজের জন্যই তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'আচার্য'। তিনিই প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম বিশ্লেষণের ধৃষ্টতা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শুধু একটি বিষয়ই বলা যেতে পারে, তা হল - মারকিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কারকে প্রফুল্লচন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হিসেবে ধরা হলেও যৌগটির 'অস্তিত্ব' এখনও অধরা, দাবি বিজ্ঞানীদের একাংশের। বরং তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব, 'জৈব নাইট্রাইট, গন্ধকযুক্ত বিবিধ জৈব যৌগ এবং ধাতব লবণের সঙ্গে তাদের বিক্রিয়া, জৈব হ্যালোজেন যৌগ বিশেষত ফ্লোরিনযুক্ত এবং পারদের ধাতু

যুক্ত জৈব যৌগ - এ সবের প্রস্তুতি ও পরীক্ষণের সূচনা' করা। কিন্তু এ বিষয়গুলি বহুল চর্চিত। তাই জীবনভর নানা কাজ, জেদের মধ্য দিয়ে কী ভাবে প্রফুল্ল-চরিত্র তৈরি হয়েছিল, তা সন্ধানেরই চেষ্টা করব আমরা।

রসায়নের ক্লাস। ছাত্রদের সামনে এক টুকরো হাড় হাতে নিয়ে বুনসেন বার্নারে পুড়িয়ে মুখে পুরে দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ছাত্রদের শেখালেন, এটা ক্যালসিয়াম ফসফেট। এছাড়া আর কিছুই নয়। সেটা কোন প্রাণীর হাড় তা-ও আর চেনার উপায় রইল না।

রসায়ন দিয়ে শুধু রসায়ন শিক্ষাই নয়, ছাত্রদের মনে ধর্মান্ধতার মূল উপড়ে ফেলার মন্ত্রটিও প্রবেশ করিয়ে দিতেন তিনি। যত টুকু দরকার, তার বাইরে কতটুকুই বা পড়ার আগ্রহ আছে আমাদের বইবিমুখ আগামীর? অথচ, বই পড়ার আগ্রহ থেকেই জন্ম হয়েছিল এই বাঙালি মনীষীর। নিজের সফলতাকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন সার্থকতার শিখরে।

১৮৬১, ২ অগস্ট অবিভক্ত বাংলাদেশের রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রপিতামহ মানিকলাল রায় ছিলেন নদিয়া (কৃষ্ণনগরের) ও যশোরের কালেক্টরের দেওয়ান। পিতামহ আনন্দলাল রায় ছিলেন যশোরের সেরেস্তাদার। পিতা হরিশচন্দ্র রায় ও মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। বাবা মায়ের আদরের সেই ছোট্ট ফুলু পরবর্তীতে

হয়ে ওঠেন ‘মাস্টার অফ নাইট্রাইটস’ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কেমন ছিল তাঁর এই জীবন পথ?

নিজ গ্রামে পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলেই তাঁর শিক্ষার সূচনা। পিতা পুত্রের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। বই পড়া অপেক্ষা পিতার সঙ্গে কথা বলে অনেক বিষয় বেশি করে শিখতেন। ১৮৪৬ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসনের লেখা ‘ব্রিটিশ কবিগণের জীবনী’ বইটি তিনি পান তাঁর পিতার কাছ থেকে। এটাই ছিল তাঁর অমূল্য পৈতৃক সম্পদ।

১৮৭০ সালে সপরিবার চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। রাত জেগে পড়াশোনা করার ফলে হজমের সমস্যা ও রক্ত আমাশয় হলে তিনি ফিরে আসেন নিজের গ্রামে। এই অসুস্থতাই ছিল তাঁর জীবনে ছদ্মবেশী-আশীর্বাদ। কারণ গ্রামে এসে তিনি অনেকখানি সময় কাটাতেন পিতার তৈরি লাইব্রেরিতে। বাঁধাধরা বইয়ের বাইরে, শেক্সপিয়ার, এমার্সন, কার্লাইল, ডিকেন্সের রচনা, নিউটন, গ্যালিলিও, ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি ইচ্ছেখুশি বই পড়ার আনন্দে মেতে উঠলেন তিনি। স্যর উইলিয়াম জোন্সের প্রশ্নের উত্তরে জোন্সের মায়ের উক্তি ‘পড়িলেই সব জানিতে পারিবে’ কথাটি প্রফুল্লচন্দ্রের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে।

সুস্থ হয়ে ১৮৭৩ সালে ফিরে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন অ্যালবার্ট স্কুলে। এরপর এন্ট্রান্স পাশ করে ভর্তি হন

মেট্রোপলিটনে। কারণ বিদ্যাসাগরের এই কলেজটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সেটি তাঁর ‘নিজের’ বলে মনে হত। ভারতে প্রথম এই প্রতিষ্ঠানটিই উচ্চশিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার মতো সুলভ করার সাহসী প্রচেষ্টা দেখায়। এফএ পড়ার সময় থেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজে 'বাইরের ছাত্র' হিসেবে অধ্যাপকদের রসায়ন বিষয়ে বক্তৃতা শুনতেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইংরাজি সাহিত্যানুরাগী প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। রসায়ন নিয়ে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সিতে। এখানে তিনি বিখ্যাত প্রফেসর আলেকজান্ডার পেডলারের সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ গৃহেই ছোট্ট গবেষণাগার গড়ে গবেষণা শুরু করেন। নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির 'গিলক্রাইস্ট বৃত্তি' পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ হন। ১৮৮২ সালে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন।

এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে ১৮৮৪ সালে বি. এস. সি. ডিগ্রি পান। এখানে 'ইন্ডিয়ান বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য মিউটিনি’ বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। সত্যের সাধক ছিলেন বলেই ভারতে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের কুপ্রভাব সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরতে পেরেছিলেন তাঁর সেই লেখায়। তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী প্রবন্ধটি পুরস্কৃত না হলেও প্রশংসিত হয়েছিল। এডিনবার্গ থেকেই ১৮৮৭ সালে ডি. এস. সি. ডিগ্রির সঙ্গে সঙ্গে ‘হোপ

প্রাইজ’ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৮-তে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়।

দেশে ফিরে কার্যত ১১ মাস কর্মহীন ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র! এই পর্বে বিশেষ ভাবে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন জগদীশচন্দ্র বসু ও বন্ধুরা। শেষমেশ ১৮৮৯-র মাঝামাঝি প্রেসিডেন্সি কলেজে আড়াইশো টাকা বেতনের ‘সহকারী অধ্যাপক’-এর কাজ জুটল প্রফুল্লচন্দ্রের। তত দিনে তাঁর যোগ্যতার প্রতি সরকার অবিচার করেছে, ক্রফট সাহেবের কাছে সে কথা বলতে অপমানও হজম করতে হল তাঁকে। ক্রফট উদ্ধত ভাবে তাঁকে বললেন, ‘আপনার জন্য জীবনে অনেক পথ খোলা আছে। কেউ আপনাকে এই পদ গ্রহণ করতে বাধ্য করছে না!’ পাশাপাশি, বাংলার শাসনকর্তা চার্লস ইলিয়ট ‘ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে’ ভারতীয়দের নিয়োগের পথ রুদ্ধ করে দিলেন।

প্রেসিডেন্সিতে বিখ্যাত অধ্যাপক স্যার আলেকজাণ্ডার পেডলারের সান্নিধ্যে নিজের ঘরেই একটি ছোটোখাটো গবেষণাগার বানিয়ে ফেলেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র, সেখানেই চলতে থাকে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নিরলস জ্ঞানচর্চা। প্রেসিডেন্সির গবেষণাগারটি হয়ে উঠল প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মার সঙ্গী। ভারতীয় নানা খাদ্যদ্রব্য ও তার ভেজাল নিয়ে এই পর্বেই গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণটি করলেন তিনি।

পাশাপাশি, তাঁর অধ্যাপক-সত্তাও ক্রমে বিকশিত হতে শুরু করল। ১৯০৯ সাল ভারতের রসায়ন তথা বৈজ্ঞানিক

গবেষণার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানিকলাল দে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পুলিনবিহারী সরকার, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, রসিকলাল দত্ত-সহ একঝাঁক কৃতী ছাত্র পেল প্রেসিডেন্সি। ছাত্রেরা পেলেন প্রফুল্লচন্দ্রকে। এঁদের অনেককে নিয়েই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পরবর্তী সময়ে তৈরি হবে 'ইন্ডিয়ান স্কুল অব কেমিস্ট্রি'

তিনি। তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গি ও রসবোধ দিয়ে বাংলা ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে রসায়নের পাঠ ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য ও মনোগ্রাহী করে তুলতেন। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সফলতার জীবন কাহিনি গল্পের ছলে তুলে ধরতেন ছাত্রদের কাছে। অল্প সময়েই শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষকতার পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর গবেষণা।

আসলে ছাত্র-রত্নদের চিনতে পারাটাই মাস্টারমশাইয়ের আসল কৃতিত্ব। এ প্রসঙ্গে জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিতের কথা বলতে হয়। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএসসি পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারেননি। কিন্তু 'ব্যবহারিক রসায়ন'-এ তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষাগারে কিছু দিন কাজ করেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে নিজের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্যও ডেকে নিলেন। কালক্রমে, জিতেন্দ্রনাথ সরকারি আফিম বিভাগে বিশ্লেষকের চাকরি পান।

প্রেসিডেন্সির পরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে ১৯১৬-এ সায়েন্স কলেজে যোগ দিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। আইনজীবী তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের দানে তৈরি এই কলেজ। কিন্তু সরকার এই কলেজ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকল। দ্বিধাহীন ভাবে বিলেতের মাটিতে দাঁড়িয়েই প্রফুল্লচন্দ্র বললেন, তাঁরা কলেজের জন্য অনুদান চাইলেই সরকার বলে 'অর্থাভাব'। উল্টো দিকে, দেশের ধনী ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে মুখ ফিরিয়ে থাকারও সমালোচনা করলেন।

অথচ নিজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকা দান, মাদ্রাজ, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রাপ্য অর্থ সেখানেই দিয়ে আসা, কলকাতার সিটি কলেজ, এমনকি গ্রামে তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির পাশে দাঁড়ানো - এমন নানা কাজ আজীবন করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র।

আসলে শিক্ষার জগতে প্রফুল্লচন্দ্র একটি 'লেগাসি'। বিষয়টি তাঁর ছাত্র নয়, বরং তাঁর 'ছাত্রের ছাত্র'র মুখে শোনা যাক। এই ছাত্রটি বলছেন, 'আমি একটা গুরুতর অপরাধ করেছি যে, স্যার পি সি রায়ের ছাত্র হতে পারিনি। সে জন্য হয়তো তিনি আমাকে ক্ষমা করেননি।...আমি তাঁর রাসায়নিক 'প্রশিষ্য' হয়েছি। পি সি রায়ের ছাত্র অতুলচন্দ্র ঘোষের কাছে আমি রসায়ন শিখেছি।' বক্তব্যটি, ভারতের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পুরস্কার যাঁর নামে, সেই শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের!

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে নিয়ে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস তাঁর 'প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানে অগ্রগতি' প্রবন্ধে লিখেছেন :-

"আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিদেশে রসায়নে কৃতবিদ্য হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশে ফিরে এলেন। এদিকে যেমন ভাবছেন কি ভাবে দেশে রাসায়নিক শিল্পের পুনরুজ্জীবন করা যায় অন্যদিকে অন্বেষণ শুরু করলেন প্রাচীন কালের পুঁথিতে রসায়নের উল্লেখের।

আচার্য রায় নিজের অধ্যাপনা আর গবেষণার কাজের বাইরের সময়টায় বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটে তার থেকে বিভিন্ন তথ্য আবিস্কার করতেন। তিনি জেনেছিলেন যে পুরাকাল থেকেই ভারতবর্ষীয়রা ক্ষার (Alkali) ও অম্লকের (Acid) প্রস্তুত প্রণালী আবিস্কার করেছিলেন। লোহা, শিসা, তামা, টিন, পারদ ইত্যাদি ধাতুদের বিশেষ অবস্থায় আনতে পারতেন। নানা শোধনক্রিয়া তাঁরা অনুসরণ করতেন। ধাতুভস্ম প্রস্তুত করার অনেক উন্নত প্রণালী তাঁদের জানা ছিল। রাসায়নিক নানা প্রক্রিয়ার জন্য তাঁরা নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। পুঁথির অনেকগুলিতে পারদের নানা রূপান্তর বর্ণনা পান তিনি। গন্ধকের সাথে নানা ধাতুর যৌগিক পদার্থ অনেকগুলি ভারতবর্ষীয়দের আবিষ্কার বলে জেনেছিলেন আচার্য। বহু বছর পরিশ্রম করে ভারতবাসীদের বিজ্ঞানচর্চার এক নতুন অধ্যায়ের খবর দিয়ে বিশ্বের পণ্ডিত মহলে এক বরেণ্য স্থান অধিকার করলেন আচার্য রায়।

এ দেশ থেকে গণিতের অনেক আবিস্কার যে আরবজাতির মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তা কোলব্রুক সাহেব আগেই দেখিয়েছিলেন। কোলব্রুক সাহেব এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে খৃস্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দীর আশেপাশে আর্যভট্ট বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। আর্যভট্ট নাকি শিক্ষা দিতেন যে পৃথিবী দৈনিক তার অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ সঠিক বার করে নাকি বলেছিলেন, চন্দ্র কি গ্রহরা কেউই নিজে আলোক বিকিরণ করে না। তাদের উদ্ভাসিত করে সূর্যের আলো। আর্যভট্টের বইয়ে নাকি পৃথিবীর ব্যাস ১০৫০ যোজন ও তার থেকে পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত ২২/৭ (pi) ধরে পৃথিবীর পরিধি ৩৩০০ যোজন দাঁড়ায়। এই নির্ধারণ সত্য পরিমাপের খুব কাছাকাছি - যোজনকে চার ক্রোশের সমান ধরলে আর এক ক্রোশের মান ১.৯ মাইল ধরলে পৃথিবীর পরিধি দাঁড়াবে ২৫০৮০ মাইল যা বাস্তবের মাপের (24901 Miles) খুব কাছাকাছি। কোলব্রুক সাহেব আরও দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষীয়রা গণিতশাস্ত্রে Surd-এর ব্যবহার জানতেন। ঋণাত্মক সংখ্যার (Negetive Number) ব্যবহার করতেন তাঁদের বিশ্লেষণে। দ্বিঘাত সমীকরণ (Quadratic Equation) বা আরো জটিল সমীকরণের সমাধান তাঁরা জানতেন।

আচার্য রায় সেই একই ব্যাপার দেখালেন রসায়নের ব্যাপারে। চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদের সঙ্গে রাসায়নিক অনেক ভারতীয় প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। মহেঞ্জোদাড়োর উৎখননের থেকে আমরা জেনেছি এ দেশেই প্রথম নানা রঙের কাচ প্রস্তুত হত। ব্রোঞ্জ আর কাঁসার ধাতুর নানান উপকরণ আমরা পেয়েছি। এ দেশেই যে বিশুদ্ধ লোহা প্রস্তুত ও রপ্তানি হত সেই খবর আমরা পেয়েছি। ইস্পাত তৈরির রহস্যও ভারতের আবিস্কার। বিখ্যাত দামাস্কাস আর টলেডোর তরবারি নির্মাণে ভারতীয় ইস্পাতই ব্যবহার হত।"

এক দিন হঠাৎই তিনি আবিষ্কার করলেন রসায়নের এক অতি বিষম বস্তু' মারকিউরাস নাইট্রাইট'। রসায়নের ইতিহাসে এক চরম আশ্চর্যজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল এই আবিষ্কার। পারদের সংস্পর্শে লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড রাখলে এই অস্থায়ী যৌগ উৎপন্ন হয়। প্রায় সমস্ত ধাতুরই নাইট্রাইট যৌগ আবিষ্কার করা সেসময় সম্ভব হলেও অত্যন্ত ভঙ্গুর ও অস্থায়ী এই বিশেষ যৌগটি কেউই তৈরি করতে পারেননি। এই গবেষণাপত্রটি প্রথম প্রকাশ পায় ‘এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল’-এর জার্নালে এবং একইসঙ্গে ১৮৯৬ সালের ২৮ মে লণ্ডনের ‘নেচার’ পত্রিকায়। এছাড়াও সালফাইডস ও হাইপোনাইট্রাইট বিষয়েও প্রচুর গবেষণা করেছেন তিনি। প্রফুল্লচন্দ্র সমগ্র জীবনে মোট ১২টি যৌগিক লবণ ও ৫টি থায়োএস্টার

আবিষ্কার করেন। প্ল্যাটিনাম, ইরিডিয়াম ইত্যাদি ধাতুর বিষয়েও তাঁর গবেষণাপত্র রয়েছে। ১৮৮৭ সালে তাঁর ডি. এস. সি. ডিগ্রির গবেষণাপত্রটি জমা দেন তিনি যার বিষয় ছিল ‘অন পিরিয়ডিক ক্ল্যাসিফিকেশন অফ এলিমেন্টস্’ (On Periodic Classification of Elements)। এছাড়া তাঁর অন্যান্য গবেষণাপত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - ‘অন অ্যানালিসিস অফ ডাবল সালফেট্স অ্যাণ্ড দেয়ার ক্রিস্টালস্’ এবং ‘হাইপোনাইট্রাইটস অফ মার্কারি’। এগুলি ছাড়াও প্রফুল্লচন্দ্র সিলভার নাইট্রাইট থেকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট কিংবা মারক্যাপ্টাইল মূলকও আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মোট গবেষণাপত্রের সংখ্যা ১০৭টি।

ইউরোপীয় বিজ্ঞানীগণ তাঁকে 'মাস্টার অব নাইট্রাইটস' আখ্যায় ভূষিত করেন। পরনে ধুতি, কালো কোট, চুল অবিন্যস্ত, তাঁর এমন উদাসীন বেশভূষায় আবৃত ছিল এক দূরদর্শী কর্মচঞ্চল প্রাণ। তিনি বুঝেছিলেন, “একটা সমগ্র জাতি শুধুমাত্র কেরানী বা মসীজীবী” হয়ে টিকে থাকতে পারে না। বাঙালি জাতিকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখালেন তিনি। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কস'। মূলধন বলতে ছিল, মাত্র আটশো টাকা আর পূর্ণ আত্মবিশ্বাস। ৯১ নম্বর, আপার সার্কুলার রোডে আচার্যের ভাড়াবাড়িটিই এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটির আঁতুড়ঘর। এর নেপথ্যে ছিল বিদেশ থেকে নানা দ্রব্যের আমদানিতে লাগাম পরানো এবং বাঙালি তথা

ভারতীয়কে কেরানি থেকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর ইচ্ছে।

এ ছাড়াও ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, ন্যাশনাল ট্যানারি ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। এডিনবার্গে থাকাকালীন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য রূপে বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানা পরিদর্শন করে রাসায়নিক কারখানা তৈরির প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তিনি। বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে তিনিই খুঁজে বের করলেন রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ধাতু সঙ্কর তৈরিতে ভারত যে পিছিয়ে ছিল না, চরক সংহিতা-সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখিত অস্ত্রোপচারের সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্র যেমন স্ক্যালপোল বা ল্যানসেট তার প্রমাণ। ইস্পাত আবিস্কারের প্রথম কৃতিত্বও প্রাচীন ভারতের। প্রাচীন রসায়নে শুধু ইজিপ্ট, সিরিয়া, চিন বা আরব নয় প্রাচীন ভাতরবর্ষও যে কতটা এগিয়ে ছিল,তা তুলে ধরতেই তিনি লিখলেন ‘দ্য হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি’। এ বিষয়ে প্যারিসের বিখ্যাত বিজ্ঞানী মার্সিলিন বের্তেলোর সান্নিধ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। এই কাজের জন্য সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিখেছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান ভাবনা যা-ই হোক না কেন, তাঁর সব কিছু জুড়ে ছিল দেশ আর দেশের প্রকৃতি। তাই ১৮৯০-এ তৈরি করেন ‘নেচার ক্লাব’। নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, রামব্রহ্ম সান্যাল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বিপিনবিহারী

সরকার ছিলেন এর সদস্য। পাশাপাশি, 'কলকাতার ফুসফুস' ময়দানে ঘুরতে যাওয়া, তা-ও করেছেন সমান ভাবে।

আসলে প্রকৃতির উপরে মানুষের কেরদানিটা সহ্য হয়নি প্রফুল্লচন্দ্রের। তাই রবীন্দ্র সরোবরে ছট করতে চাওয়া, জলাভূমি বুজিয়ে ইমারত তৈরি করার বর্তমান দেশে প্রফুল্লচন্দ্রের একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে করা যায় - "পশ্চিমবঙ্গে পুকুর বাঁধ প্রভৃতি জলসেচ প্রণালীর ধ্বংসের সহিত তাহার পল্লীধ্বংসের কাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।" এই জন-বিজ্ঞানকে বোঝাতে বাংলা ভাষায় সাধারণের উপযোগী বইও লিখেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। আদতে তিনি চেয়েছিলেন স্থিতিশীল উন্নয়ন।

লেখক হিসেবে প্রফুল্লচন্দ্র সারাজীবনব্যাপী বহু নিবন্ধ-প্রবন্ধ এবং কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী ছাত্র-পাঠ্য বইপত্র লিখেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'নব্যরসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' (১৯০৬), 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' (১৯১০), 'চা পান ও দেশের সর্বনাশ' (১৯৩২) ইত্যাদি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে ১৯৩৭ সালে লেখা 'আত্মচরিত' এবং সুবিখ্যাত 'দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল কেমিস্ট্রি' (১৯০২ ও ১৯০৯) বই দুটি প্রধান। এই দ্বিতীয় বইটিতেই তিনি প্রমাণ করে দেখান যে ভারতের রসায়নচর্চার ইতিহাস বহু প্রাচীন। সেই চরক-সুশ্রুতের সমকালীন ভারতের রসায়নচর্চার মাহাত্ম্য তিনি এই বইতে প্রমাণ করেন। তাঁর

দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হল - ‘জাতি গঠনে বাধা - ভিতরের ও বাহিরের’ এবং ‘জাতীয় সম্পদের মূলে বিজ্ঞানের শক্তি’। ১৯০৩-এ প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বাবার নামে স্থাপন করেন আর. কে. বি. কে হরিশচন্দ্র স্কুল’ এবং ১৯০৯ সালে তাঁর নিজের জন্মভূমিতে তিনি একটি সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে ‘পি. সি. কলেজ’ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০৮ সালে।

ব্যতিক্রমী এবং আমরণ উদার মহৎ কার্যের জন্য বাঙালি বিজ্ঞানী হিসেবে প্রফুল্লচন্দ্র ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ‘নাইটহুড’ উপাধি পান। তার আগে ১৯১১-তে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৯-এ মহীশূর ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘ডক্টরেট’ সম্মান জ্ঞাপন করে।

সালটা ১৯২১। বিলেত থেকে ঘুরে খুলনার গ্রামে বেড়াতে এলেন এক অধ্যাপক। কলকাতায় নামী কলেজে পড়াতেন তিনি। সারা ভারতে তাঁর নাম। এত বড়ো মানুষ, অথচ মনটা যে মাটির সঙ্গেই জুড়ে আছে। গ্রামে আসবেন না, তা কি হয়! কিন্তু এসে যা দেখলেন, সেটার কথা হয়ত কল্পনাও করেননি ওই অধ্যাপক। নিজের জন্মস্থান, খুলনার দিকে দিকে তখন হাহাকার। লোকজন মরে আছে ঘরে। জল, হাওয়া, খাবার - সবই যেন দূষিত। দুর্ভিক্ষ যেন গোটা জায়গাটিকে শ্মশান করে রেখেছে। তার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ম্যালেরিয়া। কিন্তু খুলনার জেলা প্রশাসন থেকে কিছুই স্বীকার করা হচ্ছে না। এরম অবস্থাতেই এগিয়ে

এলেন ওই মহান অধ্যাপক। গঠন করেন রিলিফ কমিটির। জোর কদমে চলতে লাগল কাজ। আগে মানুষ, তার জীবন, তারপরে বাকি সব। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আসল মন্ত্র তো ছিল এটাই।

তখনই তৈরি হল 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি। খুলনার মারাত্মক দুর্ভিক্ষে নেমে পড়েছিল এই দলটি। নেতৃত্বে ছিলেন একজন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ঋষিতুল্য এই মানুষটির পরিচয় একজন কিংবদন্তি বিজ্ঞানী হিসেবেই থেমে থাকে না। দেশীয় শিল্পেও যেমন দিশা দেখিয়েছিলেন, তেমনই মানুষের বিপদের সময় সমস্ত রকম ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। খুলনা দুর্ভিক্ষই একমাত্র নয়। একইরকম বিপদের মধ্যে পড়ে উত্তরবঙ্গ। তবে সেটার কারণ ছিল অন্য।

খুলনার দুর্ভিক্ষ পেরিয়েছে সবে এক বছর হল। ১৯২২ সালে আবারও একটা আবর্তে পড়ল বাংলা। সেপ্টেম্বরের প্রবল বৃষ্টিপাতে উত্তরবঙ্গের আত্রাই নদী ফুলে ফেঁপে উঠল। অন্যান্য নদীও থেমে থাকল না। দেখা দিল প্রবল বন্যা। ব্রহ্মপুত্রের জল আত্রাই নদী হয়ে ভাসিয়ে দিল সব জায়গা। কিন্তু কলকাতায় এই খবর একটু দেরিতেই পৌঁছয়। কারণটি সহজেই অনুমেয়। তখনকার দিনে এত আধুনিক আয়োজন ছিল না। তার ওপর যে মেল ট্রেন দার্জিলিং থেকে ছেড়েছিল, তা পার্বতীপুরে এসে থেমে আছে। আগে লাইন ভেঙে গেছে। এখন উপায়? কোনোমতে সেখানকার রেল কর্মীদের বুদ্ধিতে একটি রাস্তা খুঁজে পেয়ে তাঁরা চলে আসেন

কলকাতা। তখন প্রথম খবরে ছাপল এই ভয়ংকর দুর্যোগের কথা।

ভারত সভা হলে আয়োজিত হল জনসভা। তৈরি হল বন্যা সাহায্য কমিটি। কাজে নামল বেঙ্গল রিলিফ কমিটিও। প্রফুল্লচন্দ্র এবার আর দায়িত্ব নিতে চাইছিলেন না। পরোক্ষে থেকে সমস্ত নজরে রাখবেন, এমনই ঠিক ছিল। কিন্তু সেটা হল না। কমিটির সভাপতি'র আসনে বসলেন তিনি। অবশ্য এবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও একজন। এই ব্যক্তিটি জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। বয়সে তরুণ, কিন্তু অদ্ভুত তেজ আছে। তিনি এবার মাঠে নামলেন সবার সঙ্গে। যুবকটির নাম? সুভাষচন্দ্র বসু!

বিজ্ঞান কলেজে বন্যা সমিতির অফিস তৈরি করা হল। স্বেচ্ছাসেবক, সাধারণ মানুষ, ছাত্র, শিক্ষক - সবার উপস্থিতিতে ভরে উঠল প্রাঙ্গণ। সব জায়গায় সাহায্যের জন্য আবেদন করা হল। দেশের মানুষের কাছে তো বটেই, বিদেশেও। সুভাষচন্দ্র বসু নিজে চলে গেলেন উত্তরবঙ্গে। সংবাদের ভিত্তিতে নয়, সরেজমিনে নিজের চোখে দেখতে চান ব্যাপারটা। সেখানেও সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সময়ই উঠে এল ক্ষতির পরিমাণের প্রসঙ্গও। সবাই বুঝতে পারলেন, সরকার থেকে যে অঙ্কটা দেওয়া হচ্ছে, সেটা আসলে কিছুই না। আসল পরিস্থিতি তার থেকেও গুরুতর। একে তো রেললাইন, চাষের জমি সমস্ত ডুবে যায়। তৎকালীন স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর

অনুযায়ী, শুধু বগুড়া জেলায় ক্ষতির পরিমাণ এক কোটির ওপরে! তালোরা গ্রামে যে ২০০টি বাড়ি ছিল, তার ৭টি মাত্র অবশিষ্ট আছে। পাবনা আর রাজশাহী জেলার মিলিত ক্ষতির পরিমাণ পাঁচ কোটির ওপর। সব মিলিয়ে সংখ্যাটি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটা ভেবেই আতঙ্ক আসে আজ!

সুভাষচন্দ্র বসুর পর ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ বসুও এই কাজে এসেছিলেন। নিজে থেকেই অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এটা তো আসলে মানুষকে, দেশকে বাঁচানোর লড়াই। ঠিক যে কাজটি এক বছর আগে খুলনাতে করেছেন সবাই। সুভাষচন্দ্র বসুও সমস্তটা দিয়ে লড়েছিলেন এই সময়। পরে এই বন্যার সমস্যার জন্য সরকারকেও দায়ী করেন অনেকে। অভিযোগ, উত্তরের ছোটো রেললাইনকে বড়ো করার ফলে নিকাশি ব্যবস্থায় আঘাত পড়ে। সেইজন্য আগেও বন্যা হয়েছিল বেশ কয়েকবার। সেখানকার কর্মীরা সরকারকে বলেও; কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসন তাতে বিন্দুমাত্র সাড়া দেননি। আর সেই সময়, বন্যা বা দুর্ভিক্ষ হলে, রোগের প্রাদুর্ভাবও বেড়ে যেত। ভয় ছিল সেটারও। অথচ সরকার তথ্য চাপছে। আগেও ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু সেসব দূরে রেখে, রিলিফ কমিটি ও বন্যা সাহায্য কমিটি যে তৎপরতা দেখিয়েছিল, তা এক কথায় ছিল অভূতপূর্ব। আর এই সবকিছুর মূলে ছিলেন একজন মানুষ - আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আজকের এমন অবস্থাতেও তিনি নিশ্চয়ই থেমে থাকতেন না!

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি বলেন, "দেয়ার আর অকেশনস্ দ্যাট ডিমানডেড দ্যাট আই সুড লিভ দ্য টেস্ট টিউব টু অ্যাটেন্ড টু দ্য কল অফ দ্য কান্ট্রি। সায়েন্স ক্যান ওয়েট, স্বরাজ কান্ট।" তাঁর অর্জিত আয়ের প্রায় সবটুকুই দেশহিতার্থে দান করে গিয়েছেন। ত্যাগেই ছিল তাঁর তৃপ্তির আনন্দ। ১৯২২ সালে রসায়নে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তাঁর দানের টাকা থেকে চালু করেন 'নাগার্জুন পুরস্কার'।

১৯৪৪, ১৬ জুন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন অকৃতদার বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী। কিন্তু তাঁর প্রয়াণের পরে, এমনকি তাঁর জীবিত অবস্থাতেও বাঙালি, ভারতীয়রা কতটা রক্ষা করতে পেরেছে প্রফুল্ল-ঐতিহ্য? জীবিত অবস্থায় তাঁর শেষ জন্মদিন পালিত হয় মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে। কিন্তু এ জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি সমস্যায় পড়েছিলেন। আর প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুর পরে সমসময়ে তাঁর সাধের শিল্প প্রতিষ্ঠানটি নিয়েও নানা প্রশ্ন সামনে আসে! তাঁকে আমরা কতটা মনে রেখেছি? আমাদের অভ্যস্ত জীবনের চক্রবূহ্যে আত্মতৃপ্তি কোথায়? আত্মকেন্দ্রিক হতে হতে আমরা ক্রমশ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছি না তো?

শিল্প স্বনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিকল আজ বিলগ্নিকরণের পথে। ২০১৬ সালে এই সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। জল গড়ায় কোর্টে। সংস্থার আধিকারিক মাইক্রোবায়োলজিস্ট ও

কর্মীদের চেষ্টায় বিগত তিন অর্থবর্ষেই লাভের মুখ দেখেছে এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। গত অর্থবর্ষে এর মুনাফা হয় সর্বাধিক - প্রায় ২৫ কোটি টাকা। সংস্থার পানিহাটির ২৭ একর জমিতে রয়েছে ফিনাইল ও ন্যাপথলিন তৈরির কারখানা। এখানকার অতিরিক্ত ২৫ একর জমিও (যার বর্তমান বাজার মূল্য ৪০০ কোটি টাকা) বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এছাড়াও মানিকতলার ১৪ একর জমিতে রয়েছে ওষুধ তৈরির কারখানা। কানপুরে ৩ একর ও মুম্বাইতে একটি বাড়ি সহ দেড় একর জমি রয়েছে।

এখানকার বহু পণ্য যেমন ফিনাইল, কালমেঘ, ক্যান্থারাইডিন অয়েল, ন্যাপথালিন, ইথুরিয়া অয়েনমেন্ট, অ্যাকুয়াটাইকোটিস সহ নানা ওষুধ অত্যন্ত জনপ্রিয়। সংস্থাটির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে প্রায় চারশো কর্মীর পরিবার। সেই সঙ্গে জুড়ে আছে জাতীয়তাবাদী বাঙালির গৌরবগাঁথা। স্বাভাবিক ভাবেই এমন ঐতিহাসিক এবং বর্তমানে লাভে চলা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেঙ্গল কেমিক্যালস বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত সবাইকেই বিস্মিত করেছে। কেন্দ্রের এই বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচিত হোক। আগামী দিনে ঋণমুক্ত হয়ে মিনিরত্ন (মহারত্ন, নবরত্ন, মিনিরত্ন ১, মিনিরত্ন ২) ক্যাটাগরির তকমা আদায় করে নিক বেঙ্গল কেমিক্যালস।

প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালি জাতকে চিনেছিলেন যথাযথ ভাবেই। তা না হলে লিখতে পারেন অত দিন আগেই এই সাংঘাতিক

সত্য কথাটা - "আমাদের জীবনটা যেন দিনগত পাপক্ষয়। শুধু আলস্যের আরাম শয্যায় শয়ন করিয়া আমরা পদে পদে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিতেছি। আজ বাঙালির পরাজয় পদে পদে।" যতই কবি লিখে যান - "বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙ্গালী দিয়েছে বিয়া।" আজকের বাঙালি প্রজন্মের কাছে তার কোন মূল্যই নেই। এবার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রদর্শিত পথই হোক আমাদের লক্ষ্য। তাঁর জীবনালোকে দূরীভূত হোক আত্মবিস্মৃতির আঁধার।

আজ এই মহান বিজ্ঞানীর ১৬১তম জন্মদিবসে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

★ তথ্যঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার :- শুভ্রদেব বল, আনন্দবাজার পত্রিকা, 'আত্মচরিত' : প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' : রবীন মজুমদার, 'অন্বেষা' (প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা), 'প্রফুল্লচন্দ্র রে' : জে সেনগুপ্ত, 'জার্নাল অব দি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি', প্রহর, এই সময়, সব বাংলায়, উইকিপিডিয়া।

“যাদের ছোটোবেলাটা পার হয়েছে অথচ মানসিক শৈশবাবস্থা কাটেনি তারাই অলৌকিক শক্তির সমর্থক হতে পারে।”

-স্টিফেন হকিং

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

- সুমন কর্মকার

একটা গরিব লোক ছিল। গরিব মানে এক্কেবারে গরিব, যাকে বলে হতদরিদ্র। চাল-চুলো কিচ্ছু ছিল না। লোকটা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতো আর টুকটাক কাজ করত। এই কারও বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে ও লেগে যেতো বালি চালা অথবা ইঁট বওয়ার কাজে, কারও অনুষ্ঠান বাড়ি হচ্ছে, ও লেগে যেতো পাত পরিষ্কার করতে, যখন কিছুই জুটতো না তখন শাসকদলের মিছিলে পা মেলাতো, সেদিনের মতো রাতের খাওয়া দাওয়া তো জুটতোই, স্থানীয় নেতার মন ভালো থাকলে থাকলে কখনো সখনো বিশ পঞ্চাশ টাকা নগদও মিলে যেতো। এভাবেই চলে যাচ্ছিলো। গরিব লোকটার কোনো দুঃখ ছিল না। মনে করতো এই বেশ ভালো আছি।

তা একদিন ওই গরিবটা এরকমই একটা মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে গেলো এক বিশাল সভায়। দেখলো চারদিকে লোকে লোকারণ্য, ওর পাড়া থেকেও বহু মানুষ এসেছে এবং কাতারে কাতারে এসেই চলেছে। কোন দূর দেশ থেকে নাকি বিশাল বড় মাপের এক নেত্রী এসেছেন হেলিকপ্টারে চড়ে। তারই বক্তব্য শোনানোর জন্য সব পাড়া থেকে লোক নিয়ে আসা হয়েছে। সেই সকাল থেকে জমায়েত শুরু

হয়েছে। দুপুর নাগাদ ওকে নগদ দুশো টাকা দিয়ে দিলেই ও ফেরার পথ ধরবে। পাড়ার নেতার সাথে সেরকমই কথা হয়ে আছে। বড় নেতা, মাঝারি নেতা, ছোটো নেতার বক্তব্য শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে গেলো। ভিড়ের মাঝে সেই পাড়ার নেতার দেখাও পাওয়া যাচ্ছেনা। এদিকে খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে। মঞ্চের সবাই চলে গেলে বিকেল নাগাদ দেখা মিললো নেতার। একগাল হেসে গরিবকে দুশোটা টাকা ধরিয়ে দিলো। ওর মতো আরও অনেকেই টাকা পাওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। নেতা সবাইকে হেসে হেসে পয়সা দিতে থাকলো। গরিব টাকা নিয়ে ফেরার পথ ধরতেই যাচ্ছিলো। হঠাৎ দেখলো ওদেরই পাড়ার একটা বৌয়ের সাথে পাড়ার নেতাটার একটা ঝগড়ামতো হচ্ছে। বৌটাকে গরিবটা চেনে। গেল বছর ওর বরটা রেলে কাটা পড়েছে, এখন দু তিনটা বাড়িতে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে খায়। বৌটা এসেছে ওর তিনটে মেয়েকে নিয়ে। তার মধ্যে একটা আবার কোলে, সেটা সমানে কেঁদেই চলেছে। আর বাকিদুটো এতোই ধুঁকছে, মনে হচ্ছে এখনই মরে যাবে। বৌটার অবস্থাও তেমনই। নেতা বলছে দুশো টাকার বেশি এক পয়সা দিতে পারব না। আর বৌটা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে চলেছে, না বাবু আমরা তো চারজন আছি। কম করে তিনশোটা টাকা দাও। আস্তে আস্তে নেতার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। এখনও অনেক কাজ বাকি। এতোগুলো লোককে পয়সা দিতে হবে, পাড়ার ক্লাবে রাতের ফিস্টের সব

আয়োজন করতে হবে। আজ আবার ছেলেগুলো বাংলা ছেড়ে ইংলিশ খাবার বায়না ধরেছে। তার মধ্যে আবার এই। কাঁহাতক সহ্য হয়? বৌটাও নাছোড়বান্দা। নাকি সুরে একই কথা বারবার বলে চলেছে। নেতা আর পারলো না। হাতটা খানিক স্বয়ংক্রিয়ভাবেই একবার ওপরে উঠে আবার নীচে নেমে এলো। সপাটে একটা চড়। বৌটা বাচ্চা সমেত ধপ করে পড়ে গেলো। বাকি দুটো মেয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। নেতা একটু মুচকি হেসে নোটের গোছা হাতে পরেরজনের দিকে এগিয়ে গেলো। The show must go on.

কিন্তু না, শো টা চালু রইলো না। নেতা হঠাৎ মাথা চেপে বসে পড়লো। কোন ফাঁকে গরিবটা একগাছা ইঁট তুলে নেতার একেবারে ব্রম্ভতালুতে সজোরে বসিয়ে দিয়েছে। পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনার আকস্মিকতায় আশেপাশের লোকজন খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারই মধ্যে নেতার চ্যালাদের একজন চিল চিৎকার করে উঠলো, 'মেরে ফেললো রে, পাগলাটা কেষ্টদাকে বোধহয় মেরেই ফেললো'। পুলিশ এলো। গরিবটা পালানোর চেষ্টা করলো না। পুলিশ টানতে টানতে ওকে জিপে তুললো। জিপে ওঠার থেকেই শুরু হলো অকথ্য মার। ক্ষমতায় থাকা শাসক দলের নেতাকে 'attempt to murder' বলে কথা। খাঁকি নিজের প্রভুভক্তি প্রমাণ করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করল না। চলল বুট, লাঠির যথেচ্ছ ব্যবহার। মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে গেলে

পুলিশগুলোর একজন বলে উঠলো, 'স্যার! একে খামোখা থানায় নিয়ে গিয়ে ফ্রির খাবার খাওয়ানোর কি মানে হয়? বলেন তো এখানেই ঠুকে দিই?' স্যারের কথাটা বেশ পছন্দ হলোনা। বললেন, 'আরে ধ্যাত! সারাজীবন রাজা উজির মেরে রিটায়ারমেন্টের আগে এসে কি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব? নিয়ে চল থানায়। রাতে পার্টির লোকজন এলে ওদের হাতেই তুলে দেবো। ওরাই যা পারে করুকগে যাক।' তাই হলো। রাতের অপেক্ষায় গরিবটা আধমরা অবস্থায় গারদে পড়ে রইলো। সন্ধ্যে পেরিয়ে একসময় রাত হলো। পার্টির লোকও এলো। বিলিতি মদের গন্ধে থানাটা ম ম করতে লাগলো। গারদ থেকে টেনে হিঁচড়ে গরিবটাকে বের করে নিয়ে আসা হলো। থানা থেকে বেরিয়ে সোজা যাওয়া হবে নেতার ফার্ম হাউসে। সেখানেই গরিবটাকে খালাস করা হবে। শালার বড্ড বাড় বেড়েছে। কিন্তু এ কি! এতো আওয়াজ কিসের? এতো আলোই বা আসছে কোথা থেকে? একটা হাবিলদার স্যান্ডো গেঞ্জি পরে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলো, 'হুজুর লাল পার্টির লোক এসেছে। হাতে মশাল নিয়ে থানা ঘেরাও করে বসে আছে। বলছে ওরা নাকি গরিবটার নিঃশর্ত মুক্তি চায়।' গরিবটা মেঝেতে পড়ে পড়ে এসব শুনে অবাক হয়ে গেলো। ওকে বাঁচাতে এত্তো লোক এসেছে? এরা কারা? শুনতে শুনতে একসময় ও পুরোপুরি ঝিমিয়ে পড়লো। যেটুকু চেতনা ছিল তাতেই বুঝত পারলো পুলিশগুলো ওকে বের করে নিয়ে আসছে। চারদিক থেকে

গগনভেদী কান ফাটানো আওয়াজ আসছে, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। পুরোপুরি জ্ঞান হারানোর আগে ও দেখলো কয়েকজন ওর মতোই হতদরিদ্র মানুষ ওকে বুকে জাপটে জড়িয়ে ধরছে আর বলে চলেছে কয়েকটা অদ্ভুত শব্দ। 'লাল সেলাম, কমরেড'।

যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সত্য কি তাহা জানে এবং বোঝে, কিন্তু জীবনে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে - মনের গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সত্যের নিকট লজ্জায় মস্তক অবনত করিতেছে অথচ বাহিরে জনসমাজে এবং সভার মাঝে তাহাকে স্বীকার করিবার সাহস নাই – সে জাতি কেমন করিয়া জগতের নিকট সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।”

– আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ভারতীয় আস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদ (নাস্তিক্যবাদ)

-সৌরাষ্ট্র দাশ

ভূমিকা: আপনাকে মনে রাখতে হবে। এই লেখা" ভারতীয় বস্তুগত সংস্কৃতি তাই এই লেখার সাথে' বর্তমান ভাষা সাহিত্য মিল কম। নাস্তিক শব্দ মানে ! বেদ বিরোধী ভারতীয় দর্শন মতে, এই নাস্তিক শব্দ বাংলাতে বলে = অনীশ্বরবাদী ইংলিশে Atheist বলা হয়। আমরা সবাই কম বেশি জানি। আর ভারতে কিছু নাস্তিকও নাস্তিকতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত পড়ালেখার অভাবের কারণে এই ভুলটি বলে থাকেন। ভারতবর্ষে উদ্ভূত দর্শনসমূহকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় আস্তিক ও নাস্তিক। যে দর্শন বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করে তা আস্তিক। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয়টি আস্তিক দর্শন এবং এগুলিকেই একত্রে বলা হয় ষড়্‌দর্শন।

আর চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন বেদে বিশ্বাসী নয় বলে এগুলি নাস্তিক দর্শন হিসেবে পরিচিত। উলে-খ্য যে, আস্তিক-নাস্তিকের ক্ষেত্রে ঈশ্বরে বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনো কারণ নয়, যেমন ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও মীমাংসা জগতের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, অথচ উভয়ই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে। বৈশেষিক দর্শনেও সরাসরি ঈশ্বরের কথা নেই। সাংখ্য ও যোগ জগতের স্রষ্টা

হিসেবে পুরুষ ও প্রকৃতিকে স্বীকার করলেও যোগ ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাসী। ন্যায় আত্মা ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েও জগতের স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার করে এবং বেদান্ত ঈশ্বর (সগুণ ব্রহ্ম) তথা ব্রহ্মে (নির্গুণ) বিশ্বাসী; বেদান্তমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সব মিথ্যা। ফলে দেখা যায় যে, একই উৎস থেকে জন্ম হলেও আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে অমিল রয়েছে এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন মতামত পোষণ করে।

চার্বাক দর্শন নাস্তিক দর্শন জড়বাদী। চার্বাক বা নাস্তিক দর্শন যে অতি প্রাচীন। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ ও সাহিত্যে,মহাভারতে এই মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। জড়বাদী দর্শন ঘোরতর বেদ-বিরোধী এবং বেদ নিন্দুক তাই [১] মনুস্মৃতি তে ঋষি মনু বলেছেন "নাস্তিকো বেদনিন্দুকঃ"-অর্থাৎ যে বেদ নিন্দা করে (অপমান, ত্যাগ করে অথবা বিরূদ্ধাচরণ করে তাহলে কাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করো)। কেউ যদি চেতন-সত্ত্বা কে অস্বীকার করে জড়বাদী হয়, তা তার বুদ্ধি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।

চার্বাক মতে, পাপ নেই, পুণ্য নেই। পাপ-পুন্যের কর্মফল ভোগও নেই। অতিপ্রাকৃত কিছুই নেই। ঐহিক ইন্দ্রিয় সুখই একমাত্র সুখ। দেহের মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না। ইন্দ্রিয়লিপ্সু সাধারণ মানুষের কাছে চার্বাক নিতি খুবই

হৃদয়গ্রাহী বা মনোরম, সহজ কথায় বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মনগ্রন্থ, আয়ুর্বেদ..ভারতীয় দর্শনের মূল চিন্তাভাবনা থেকে চার্বাক, নাস্তিকতা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। এই দর্শনের কথা হল-কামের (ইন্দ্রিয়-সুখ) চরিতার্থই মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য বা পরমপুরুষার্থ যা অন্যান্য দর্শন ও বৈদিক শাস্ত্রে ত্রিবিধ দোষ থেকে মুক্তির উপায় বা মোক্ষ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এই দর্শন বলে-যতদিন বাঁচবে ভোগ-সুখে বেঁচে থাক, প্রয়োজন হলে ঋণ করেও ঘি খাও। জীবনে খাও-দাও ফূর্ত্তি কর, কেননা আগামীকালই তোমার মৃত্যু হতে পারে। ভবিষ্যতের না-পাওয়া সুখের মিথ্যা ছলনায় বর্ত্তমানকে ত্যাগ করো না। বাকি কিছু বৈদিক মান্যতা গ্রহণ করে তাঁরা এটা মানে সুখই স্বর্গ, দুঃখই নরক কিন্তু সুখের পরিভাষা তাঁদের আলাদা।

এই মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা নেই, দেহের সুখই আত্মার সুখ। কোন কারণেই নিজেকে ইহলৌকিক সুখ থেকে বঞ্চিত করো না। সাধারণ লোকের কাছে এই ধরনের কতা শ্রুতিমধুর বা চারুবাক্ বলে এই দর্শনের নাম "চার্বাক" হয়েছে। তবে অনেক পন্ডিতের মতভেদ আছে "চার্বাক" নামের উৎপত্তি বিষয়ে।

যেমনঃ "চর্ব"-ধাতুর অর্থ হল "খাওয়া দাওয়া করা বা চর্বণ করা"। এই দর্শনের খাওয়া দাওয়াকে, ইন্দ্রিয়-সুখকে,

জীবনের পরমপুরুষার্থ বা কাম্যবস্তুরূপে মনে করে বলে এর নামকরণ "চার্বাক" হয়েছে। চার্বাকের একটি নীতিবাক্য হল "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋনং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"। আবার অনেকের মতে এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা দেবগুরু বৃহস্পতি। চারু শব্দের একটা অর্থও বৃহস্পতি। তাহলে "চারুর্ বাক্" অর্থাৎ "বৃহস্পতির কথা"। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে এই দর্শন অনুসরণ করে অসুরকুল যাতে সমূলে ধ্বংস হয় তার আয়োজন। এই দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে যথাঃ বৈতন্ডিক, ধূর্ত, সুশিক্ষিত।

এই জ্ঞানতত্ত্বের সার কথা হলঃ (ক) প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ [প্রত্যক্ষমেকৈব্-Perception is the only source of Knowledge], চার্বাকের এই মত মানলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন জীবে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান না করলে চলে না। লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য তাই প্রত্যক্ষ-অতিরিক্ত অনুমানকেও স্বীকার করতে হয়। (খ) অনুমান প্রমাণ নয়, (গ) আগম বা শব্দ প্রমাণ নয়, (ঘ) বেদবাক্য, শ্রুতিবাক্য প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য নয় কোন বিজ্ঞানীর শ্রুতি বাক্য বা অনুমান তাঁর মান্যতাদেয়। প্রত্যক্ষের অর্থ প্রথমত অনুভব {ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ(যোগ) জনিত অনুভব}, দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ অপরোক্ষ অনুভব [টেবিল দেখে টেবিলের যে জ্ঞান তা অন্য কোন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না],তৃতীয় প্রত্যক্ষ সম্যক

অনুভব [সম্যক অর্থে সংশয়শূন্য ও বিপর্যয়শূন্য। অনিশ্চিত জ্ঞান হচ্ছে সংশয়। যেমন- ঐ বস্তুটি মূর্ত্তি, না মানুষ? মিথ্যা জ্ঞানকে বলে "বিপর্যয়"-আকাশে দুটি চাঁদের জ্ঞান]। প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ-বাহ্যপ্রত্যক্ষ [চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক-এই পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের জগতের যে সাক্ষাৎ] ও মানসপ্রত্যক্ষ [মনের সাহায্যে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ]।

ন্যায় দর্শন বা বৈশেষিক দর্শনের সমস্ত প্রামাণ কে চার্বাক দর্শন গ্রহন করে না, বৈদিক দর্শন শাস্ত্রে "প্রত্যক্ষ" শব্দটি-কে যেমন যথার্ত জ্ঞান লাভের উপায় অর্থে ব্যবহার করা হয় তেমনি আবার 'যথার্থজ্ঞান' অর্থেরও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ "প্রত্যক্ষ" শব্দটি একই সঙ্গে "প্রমাণ" এবং "প্রমা" অর্থে ব্যবহার করা হয়।

চার্বাক মতে, প্রত্যক্ষ আবার সবিকল্প অথবা নির্বিকল্প হতে পারে[যেমন- আমি "একটা কিছু" দেখেছি, কিন্তু সেটা কি বস্তু, সে জ্ঞান একনও হয়নি]। যাই হোক অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রে প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে স্বীকার করলেও একমাত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। চার্বাক মতে পরোক্ষ জ্ঞান অস্পষ্ট ও অযথার্থ, এই যুক্তি তে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও অযথার্থ বলতে হয়, কেননা প্রত্যক্ষজ্ঞানও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-নির্ভর, তাই তা পরোক্ষ তা অযথার্থই।

আবার দেখুন নাস্তিক চার্বাক মতে "সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যথার্থ"-সকল ক্ষেত্রেই বলতে বর্তমান,অতীত ও ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বোঝায়, যা প্রৎয়ক্ষের দ্বারা যাচাই করা যায় না। তাহলে মানতে হয় যে, চার্বাকরা প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। চার্বাক মতে, 'অনুমান ও শব্দ" প্রমাণ নয়, যেখানে ঋষি বাক্যও বৈদিক সংস্কৃতিতে শব্দ প্রমাণ মানা হয়। চার্বাক মতে অনুমান ও শব্দ-প্রমাণ অনেক সময় ভ্রান্ত জ্ঞান দেয়। একই যুক্তিতে প্রত্যক্ষেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায় না, কেননা প্রত্যক্ষজ্ঞানও অনেক সময় ভ্রান্ত হয়। রুজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে (মুক্তো) রজত (রৌপ)-ভ্রম হয়। চার্বাক মতে অনুমান প্রমাণ নয়, কেননা অনুমানের দ্বারা "প্রমা" অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানলাভ হয় না। ধূম দেখে বহ্নির যে জ্ঞান তা অনুমানলব্ধ জ্ঞান। এ জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের মতে কখনই নিঃসন্দগ্ধ হতে পারে না। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানের ওপর নির্বর করে। ব্যপ্তি হল হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নিয়ত সহচর-সম্বন্ধ। দূরের পাহাড়ে ধূম দেখে যখন "সেখানে আগুন আছে" বহা হয়, তখন তা হল অনুমান। এখানে অনুমান প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ

ঐ প্রর্বতটি ধূমযুক্ত যে যে বস্তু ধূমযুক্ত সেই সেই বস্তু বহ্নিযুক্ত পর্বতটি বহ্নিযুক্ত।

প্রতিটি অনুমানের ক্ষেত্রে তিনটি পদার্থ থাকে-পক্ষ, হেতু ও সাধ্য (যা অনুমিত হয় তা সাধ্য)। এখানে 'বহ্নি" হচ্ছে সাধ্য, কেননা বহ্নি অনুমিত হয়েছে। যার সম্বন্ধে অনুমিত হয় তা পক্ষ। এখানে "পর্বত" সম্বন্ধে অনুমিত হয়েছে। তাই পর্বত হচ্ছে "পক্ষ"। যার সাহায্যে বা য়ার ওপর নির্বর করে অনুমিত হয় তা হেতু। এখানে ধূম হচ্ছে "হেতু", কেননা ধূম-প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে পর্বতে বহ্নি অনুমিত হয়েছে।হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহচর-সম্বন্ধ হল ব্যপ্তি। হেতু ও সাধ্যের 'নিয়ত সম্বন্ধ" বলতে বোঝায়- যেখানে হেতু সেকানে সাধ্য এবং এমন কোন ক্ষেত্রে নেই যে, হেতু আছে কিন্তু সাধ্য নেই। উল্লিখিত উদাহরণে ধূম (হেতু) ও বহ্নি (সাধ্য) মধ্যে নিয়ত সাহচর্য বা ব্যপ্তি-সম্বন্ধ আছে। যেখানে ধূম আছে সেখানে বহ্নি আছে এবং এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেকানে ধূম আছে কিন্তু বহ্নি (আগুন) নেই।

নাস্তিক দর্শনগুলি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না; সেগুলি অনাত্মবাদী ও জড়বাদী। চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় এবং যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষযোগ্য নন, সেহেতু তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধদর্শনের আলোচ্য বিষয় মানবজীবন; মানুষের দুঃখমোচনই এ দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য। বৌদ্ধমতে জগতের সবকিছু ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনই জগতের একমাত্র সত্য; যেহেতু কোনো কিছুই শাশ্বত নয়,

সেহেতু নিত্য আত্মা বলতেও কিছু থাকতে পারে না। জৈনরা দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। এ দর্শনে দ্রব্যসমূহকে ‘অস্তিকায়’ ও ‘নাস্তিকায়’ নামে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যার বিস্তৃতি ও কায় (দেহ) আছে তা অস্তিকায়, যথা জীব ও অজীব (জড়) এবং যার বিস্তৃতি ও কায় নেই তা নাস্তিকায়, যথা কাল (time)। বঙ্গদেশে উপরিউক্ত দর্শনসমূহের প্রত্যেকটিরই কম-বেশি চর্চা হয়েছে এবং এখনও গুরুপরম্পরা ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে হচ্ছে; তবে ন্যায়, বিশেষত নব্যন্যায়ের চর্চার জন্য এক সময় এদেশ সমগ্র ভারতে বিখ্যাত ছিল।

নাস্তিক্যবাদ বিশ্বাস নয় বরং অবিশ্বাস এবং যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস নয় বরং বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই এখানে মুখ্য। ইংরেজি ‘এইথিজম’(Atheism) শব্দের অর্থ হল নাস্তিক্য বা নিরীশ্বরবাদ। এইথিজম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক ‘এথোস’ (ἄθεος) শব্দটি থেকে। শব্দটি সেই সকল মানুষকে নির্দেশ করে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রতি অন্ধবিশ্বাস কে যুক্তি দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে। দিনদিন মুক্ত চিন্তা, সংশয়বাদী চিন্তাধারা এবং ধর্মসমূহের সমালোচনা বৃদ্ধির সাথে সাথে নাস্তিক্যবাদেরও প্রসার ঘটছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম কিছু মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যার ২.৩% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে

পরিচয় দেয় এবং ১১.৯% মানুষ কোন ধর্মেই বিশ্বাস করে না। জাপানের ৬৪% থেকে ৬৫% নাস্তিক অথবা ধর্মে অবিশ্বাসী। রাশিয়াতে এই সংখ্যা প্রায় ৪৮% এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ ৬% (ইতালী) থেকে শুরু করে ৮৫% (সুইডেন) পর্যন্ত। পশ্চিমের দেশগুলোতে নাস্তিকদের সাধারণ ভাবে ধর্মহীন বা পরলৌকিক বিষয় সমূহে অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের মত যেসব ধর্মে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় না, সেসব ধর্মালম্বীদেরকেও নাস্তিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিছু নাস্তিক ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দু ধর্মের দর্শন, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং প্রকৃতিবাদে বিশ্বাস করে। নাস্তিকরা কোন বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী নয় এবং তারা সকলে বিশেষ কোন আচার অনুষ্ঠানও পালন করে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যে কেউ, যে কোন মতাদর্শে সমর্থক হতে পারে,নাস্তিকদের মিল শুধুমাত্র এক জায়গাতেই, আর তা হল ঈশ্বরের অস্তিত্ব কে অবিশ্বাস করা।

ইংরেজিতে Believe, Trust, Faith এই তিনটি শব্দের অর্থ আগে জেনে নেয়া যাক।

Believe (অনুমান, বিশ্বাস, বিশেষভাবে প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেয়া)

1. accept that (something) is true, especially without proof.

2. hold (something) as an opinion; think.

যেমন, ভুতে বিশ্বাস করা। এলিয়েনে বিশ্বাস করা। অথবা, বিশ্বাস করা যে, অতীতে আমাদের পুর্বপুরুষ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল। যার সপক্ষে এই বিশ্বাসী মানুষটি কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলেও তা তিনি বিশ্বাস করেন।

Trust (আস্থা)

1. firm belief in the reliability, truth, or ability of someone or something.

কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা বা ধারণার আলোকে কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা। যেমন আমি আমার অমুক বন্ধু সম্পর্কে আস্থাশীল যে, সে টাকা ধার নিলে আমাকে ফেরত দেবে। বা ধরুন, অমুক পত্রিকাটি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ছাপে বলে আপনি মনে করেন। কারণ, অমুক পত্রিকাটি কয়েকবছর ধরে পড়ার কারণে পত্রিকাটির প্রতি আপনার আস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এখানে, আপনার এই আস্থার পেছনে কারণ হিসেবে রয়েছে আপনার পুর্ব অভিজ্ঞতা।

তথ্যসূত্র

1 || মনুস্মৃতি 2/11

2 || চার্বাক দর্শন- হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়

3 || লোকায়ত দর্শন- দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

4 || সত্যার্থ প্রকাশ- দয়ানন্দ সরস্বতী

5 || ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস- নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

6 || Sutta Nipata - Khuddaka Nikaya

7 || Materialism in Indian Thought - K.K. MITTAL

মেকআপ

–রূপসা রায়

প্রথম -

বাড়ি ফিরেই তাড়াতাড়ি মেকআপ তুলতে থাকে শীর্ষা, রবিন জানতে পারলে কি হবে ভেবে উঠতে পারেনা সে। গত তিন বছর ধরে এই মেকআপ তার ভরসা। তিন বছর আগে হঠাৎই গাড়ি এক্সিডেন্টে রবিনের শরীর প্যারালাইসিস হয়ে যায়, সেই থেকে চলছে। চারিদিকে শকুনের চোখ আর চাকরির অভাবের বাজারে 'call girl' এর পেশাই তার একমাত্র ভরসা। দুঃখ, কষ্ট সব লুকিয়ে রেখেছে এই মেকআপের আড়ালে।

এই পেশায় সুন্দরী সাজতে হয় তাকে নাহলে যে শরীর পছন্দ হবেনা বাবুদের, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে তার। রবিন কথা বলতে না পারলেও বুঝতে পারে, তাই লোকানোর চেষ্টা! মেকআপ ধুয়ে এসে সোফায় বসতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে শীর্ষা।

দ্বিতীয় -

- "ইস! অনেক বুড়ি লাগছে তো! "

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা গুলো বলে রণিতা। বয়স তার বিয়াল্লিশ কিন্তু স্ট্যাটাস মেইনটেইন করতে বয়স কমানোর চেষ্টায় তিনিও পিছপা হননি।

প্রায় এক ঘন্টা মেকআপ করে উঠে ব্যাগ টা নিয়ে বেরিয়ে পরে শপিংয়ে। আজ সব ত্রিশ বছর বয়সী মহিলারা একসাথে শপিং করবে। মেকআপের আড়ালে ঢাকা পড়েছে বয়সটা।

তৃতীয় -

যন্ত্রনায় কেঁপে ওঠে তার শরীরটা। আগের রাতের অত্যাচার আর মারে সারা মুখে কালশিটের দাগ পড়েছে স্নেহার। এদিকে অফিসের সময় আগত।

তাড়াতাড়ি উঠে ফ্রেশ হয়ে বাড়ির সমস্ত কাজ করে মেকআপ করতে বসে সে। অফিসের সবার সামনে 'Happy family' এর 'show off' এর অভিনয়টা সে ভীষণ সুন্দর ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন। এতো তাড়াতাড়ি হারলে চলবেনা বাচ্চাটা যে বড্ডো ভালোবাসে বাবাকে!

চতুর্থ -

- "মেয়ে যে এতো কালো সে কথা তো আগে বলেননি? নানা, এই বিয়ে হবেনা।"

এবার আর এই কথা শুনতে হয়নি প্রিয়াকে। প্রতিবার এভাবেই তার বিয়ে ভেঙে যায়। তাই এবার সে পার্লার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে মেকআপ দিয়ে ঢেকে নিয়েছে তার আসল রূপ, ফুটিয়ে তুলেছে এক নকল ফর্সা চেহারা।

পাত্রপক্ষ বেরিয়ে গেলে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে সে, ঘষে ঘষে মেকআপ তুলতে থাকে। আয়নার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সে - "কালো হওয়া কি পাপ ভগবান?"

পঞ্চম -

বাড়ি এসে নকল মেকআপ আর নকল পরচুলা টা খুলে ফেলে তৃষা। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার, নিজের পরিচয় লোকানোর চেষ্টায় আজ জয়ী হলেও নিজের কাছে হেরে গেছে তৃষা।

চার বছর ধরে সে এই নকল 'আলিয়া' হয়ে জীবনযাপন করছে। চার বছর আগের করা অপরাধ কাঁদাচ্ছে তাকে আজ।

চার বছর আগে -

তৃষা - "স্যার, সব কটাকে খুন করে ফেলেছি এবার আমার টাকা টা দিন স্যার। আমার বাবাকে বাঁচাতে পারবোনা নাহলে, প্লিজ স্যার।"

বাবার অপারেশনের টাকা যোগাড় করতে পাঁচটা খুন করতে বাধ্য হয় সে। আর তার পরেই সারা পৃথিবীর কাছে তৃষা মল্লিক মৃত। রাতারাতি দেশ ছেড়ে বিদেশে অন্য নাম অন্য পরিচয় নিয়ে বেঁচে আছে সে। প্লাস্টিক সার্জারি করেও মুখের কিছুটা আদল একই রয়ে গেছে সেটাই মেকআপ আর পরচুলা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা চলবে সারাজীবন।

"বলা বাহুল্য যে, বিগত কুড়ি বৎসর ধরিয়া বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব নিহিত আছে।"

-ডঃ মেঘনাদ সাহা(1893 - 1956)

দেশপ্রেম ও কিছু কথা

-জামাল আনসারী

বর্তমানে আমাদের দেশে দেশপ্রেমেরের জোয়ার বইছে। অভুক্ত শরীরেও দেশপ্রেম টগবগ করে ফুটছে।

কিন্তু দেশপ্রেম কি?

তা হইতো অনেকেই জানেন না।দেশপ্রেম বলতে শুধুই দেশের প্রতি প্রেম বোঝায় না, দেশের মানুষের প্রতি প্রেমও বোঝায়।

দেশ যদি ভালোবাসার মতো কাজ করে, তবে দেশের মানুষ আপনা আপনি দেশকে ভালোবাসবে। কাউকে জোর করে বলার দরকার নেই, দেশকে ভালোবাসো, দেশকে ভালোবাসো।

কিন্তু ভারত সরকার থুড়ি মোদীর সরকার দেশের জনগনকে এখন ঘাড় ধরে দেশপ্রেমের পাঠ শেখাতে নেমেছে। আর এখানেই দেশের বহুত্ববাদের সঙ্গে বিরোধ বাঁধছে। মোদীর সরকার যা বলছে তা ভুল হলেও ঠিক বলে চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে হবে, নইলে আপনাকে দেশদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে ছাপ মেরে দেবে।তারপর যা ঘটে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারত সরকার ও মোদী সরকার এখন সমার্থক হয়ে উঠেছে। সরকার দেশপ্রেমের নামে উগ্র হিন্দু তালিবানী

শাসন চালু করতে চাইছে। যা ভারতের মতো ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে যথেষ্ট চিন্তার বিষয় বটে।তাই সাধারণ শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের এখনই এই স্বৈরাচারী শাসনের উপরে প্রতিবাদ না জানালে, আগামী দিনে হয়তো চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছু উপায় থাকবে না।

দেশ জুড়ে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদের চাপে ও গৈরিক বাহিনীর ভয়ে দেশের এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে সামরিক সাঁজোয়া গাড়ি মোতায়েন থাকবে, যা দেখে ছাত্র ছাত্রীদের মনের মধ্যে দেশপ্রেমেরের বাতাবরণ তৈরি হবে। কিন্তু এতে হিতে বিপরীতও হতে পারে। যেহেতু জোর করে মানুষের মনে দেশপ্রেম কখনও জাগানো যায় না।

মাদ্রাজ হাই কোর্টের মহামান্য বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, দেশের স্কুল, কলেজ, অফিসে এখন থেকে "বন্দে মাতরম" গানটি বাধ্যতামূলক ভাবে গাইতে হবে। কিন্তু এর ফলে কি দেশপ্রেম বাড়বে? তা হইতো আগামী দিনে বোঝা যাবে।তবে দেশের শাসন বিভাগের নির্দেশে বিচার বিভাগ অতি সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলে জন সাধাণের চিন্তা বাড়ছে বলে মনে হয়।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতো মানুষকে যেভাবে দেশের সরকার পদে পদে স্বাধীন মত প্রকাশের

অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে, অপমান করছে।সেটা মোটেই ভালো লক্ষণ নই। দেশ এক ভয়ংকর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

দেশের এক ভণ্ড যোগগুরু তো প্রকাশ্য সমাবেশে হুমকি দিচ্ছে, "ভারত মাতা কি জয়" না বললে মুণ্ডু কেটে নেওয়া হবে।এটাই কি দেশপ্রেম এর স্বরূপ? এগুলো কি মেনে নেওয়া যায়?

এখন তো আবার একটি নিরীহ পশুকে নিয়ে দেশের সরকার যেভাবে মেতে উঠেছে, তা দেশের মানুষের কাছে যথেষ্ট চিন্তার বিষয়ই বটে। মোদী রাজে যেখানে সেখানে অপ্রীতিকর ঘটনা বেড়েই চলেছে।মানুষের জীবনের চেয়ে এই পশুটি এখন মহা মূল্যবান হয়ে উঠেছে। এই পশুটিই বর্তমানে মোদী সরকারের রাজনৈতিক প্রানী হয়ে দাঁড়িয়েছে। গরুর জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত খুন বা গনধোলাই এর শিকার হতে হচ্ছে। এরকম দেশপ্রেম আমরা চাই না।যে দেশপ্রেম মানুষের থেকে পশুকে মূল্যবান মনে করে।

এই মেকি দেশপ্রেমেরের প্রতিবাদ চাই। তাই দেশের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের কাছে অনুরোধ করবো, দেশকে বাঁচাতে, দেশের মানুষ কে বাঁচাতে, দেশের গনতন্ত্র কে প্রতিষ্ঠা করতে, দেশের বহুত্ববাদকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে।

অলৌকিক চিকিৎসা শিবিরের বুজরুকি ফাঁস

-সন্তোষ শর্মা

আমাদের দেশ ভারত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্রমশঃ উন্নতি করে চলেছে। বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নিত্যদিন নব্যনতুন অনুসন্ধান ও আবিষ্কার হচ্ছে। একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রতি উৎসাহ বাড়ছে। মানুষকে মস্তিস্ককোষ থেকে অনেক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কর সময়ের সঙ্গে দূর হয়ে চলেছে। কিন্তু এটি তো দেশের একাংশের চিত্র। কারণ আজও অনেক মানুষ ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র, ভূত-প্রেত, ওঝা, তান্ত্রিক, জ্যোতিষী, অলৌকিক ও কাল্পনিক গুলগল্পে এবং অন্ধবিশ্বাসে ডুবে রয়েছে। এই সব অন্ধবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণীর প্রতারক অর্থাৎ ওঝা, তান্ত্রিক, জ্যোতিষী, বাবাজী, মাতাজির মতন বুজরুকদের লোক ঠকানো ও বুজরুকি ব্যবসা ফুলেফেঁপে আছে। আজও অনেক বুজরুকরা অলৌকিক ক্ষমতা, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে যে কোনও রোগের চিকিৎসা করার দাবি জানাচ্ছে। কিন্তু ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, তন্ত্রমন্ত্র, অলৌকিক উপায়ে যে কোনও রোগের চিকিৎসার দাবি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এর পরেও আজও এই পশ্চিমবঙ্গে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে,

হেঁকেডেকে রীতিমতো অলৌকিক স্বাস্থ্য শিবির খুলে বুজরুকি ব্যবসা চলছে। সাধারণ এবং গরীব লোকেদের অন্ধবিশ্বাস, দারিদ্র ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ফুলেফেঁপে চলেছে অলৌকিক ও বুজরুকি ব্যবসা। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সব কিছু জানা সত্ত্বেও পুলিশ ও প্রশাসন মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন।

অন্য দিকে আমরা যুক্তিবাদীরাই এই বুজরুকি ব্যবসা বন্ধের জন্য সব সময় সক্রিয়। যেখানেই বুজরুকি, সেখানেই যুক্তিবাদীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বুজরুকি মুখ থুবড়ে পড়ে। আজ এমনই একটি সত্যি ঘটনা লিখছি যা যুক্তিবাদী আন্দোলনকারীকে বুজরুকি ফাঁসের জন্য উৎসাহিত করবে।

মঙ্গলবার ১০ এপ্রিল ২০১২

গ্রামের মাঝে একটি খোলা মাঠ। বিচালির ছাউনি দেওয়া দু-একটি কুঁড়ে ঘর। আশে-পাশে কয়েকটি গাছ। তার ছায়ার নীচে ছয় থেকে ৬০ বয়সের ছেলে, মেয়ে, মহিলা, পুরুষ, বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ বসে আছেন। এঁরা দূর-দূরান্ত থেকে এখানে এসেছেন নিজের জন্মান্ধ, মূক-বধির, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, থেকে মাথার যন্ত্রণা, যৌনরোগ, বাত, আলসার-সহ বিভিন্ন অসুখের চিকিৎসা করাতে। খোলা মাঠে গাছের ছায়ায় নিচে রীতিমতো স্বাস্থ্য শিবির চলছে। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন এই স্বাস্থ্য শিবিরে কোনও চিকিৎসক নেই। দু'জন সহকর্মীর সহায়তায় একজন ব্যক্তি তাঁর

'অলৌকিক ক্ষমতা'র সাহায্যে শুধুমাত্র রুগীর কানে, মুখে, চোঁখে 'ফুঁ' দিয়ে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে 'হাত বুলিয়ে' বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করছেন। মধ্য বয়স্ক এই অলৌকিক চিকিৎসকের (?) নাম পঞ্চানন মাইতি। তিনি দাসপুরের গোসকপোতা গ্রামের নিবাসী। তাঁর দুই সহযোগী অরুণ গোস্বামী এবং সুকুমার সামন্ত। এঁরা রামদেবপুরের বাসিন্দা। প্রতি মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার পালপুর গ্রামের জানাপাড়ায় এই স্বাস্থ্য শিবির বসে। খোলা মাঠের এই শিবিরে এলেই প্রথমে প্রতিটি রুগীর পরিজনকে ১০ টাকায় বিনিময়ে একটা পুস্তিকা কিনতে হয়। পুস্তিকা বললে ভুল হবে কারণ এক টাকা দামের ছোট পাতলা খাতায় পেন দিয়ে কয়েকটি মন্ত্র লেখা থাকে। এর পর পঞ্চাননের দুই সহযোগী অরুন এবং সুকুমার মাঠে বসে থাকা প্রতিটি রুগীর কাছে গিয়ে তাঁর নাম, ঠিকানা, বয়স, রোগ ইত্যাদি একটি খাতায় লিখে রাখেন।

ফুলপ্যান্ট ও হাফ শার্ট পরিধানে পঞ্চানন মাইতি তাঁর এই শিবিরে চিকিৎসার জন্য আসা রুগীর এবং তাঁদের পরিজনদের উদ্দেশ্যে জোরে-জোরে বলতে শুরুর করেন, "আপনারা চিকিৎসার জন্য বড়-বড় হাসপাতালে ঘুরে-ঘুরে অনেক টাকা, পয়সা ও সময় নষ্ট করেছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। শেষ আশার আলো দেখতে আজ আমার 'অলৌকিক শিবিরে' এসেছেন। কথা দিচ্ছি এখান থেকে

কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যাবেন না। আমার ফুঁ ও হাতের স্পর্শ পেয়ে বোবা কথা বলে। জন্মান্ধ দু'চোখ খুলে জগৎ দেখে। কানে কালাও সব কথা শুনতে পায়। ল্যাংড়া, খোঁড়াও ঘোড়ার মতন দৌড়তে শুরু করে। যে যেখান বসে আছেন, সেখানেই একটু ধৈর্য ধরে বসুন। আমি নিজেই আপনাদের কাছে এসে রোগমুক্তি করব। কেউ নিরাশ হয়ে ফিরবেন না। অবশ্যই ফল পাবেন।"

রোগীদের কাছে বিক্রি করা একটি পুস্তিকা নিজের হাতে নিয়ে পঞ্চানন বললেন, "এই পুস্তিকাতে রোগ মারণ মন্ত্রের শ্লোক লেখা আছে। আমি এই শ্লোকগুলি পাঠ করছি। আমরা সঙ্গে-সঙ্গে আপনারাও সব্বাই একসাথে শ্লোকগুলো পাঠ করুন।"

এরপর পঞ্চানন সহ অন্যান্য লোকেরা একযোগে মন্ত্র ও শ্লোক পাঠ করলেন। সব্বাইকে থামিয়ে দিয়ে রুগীদের অলৌকিক চিকিৎসা শুরু করলেন পঞ্চানন বাবাজী। দূর গ্রাম থেকে নিজের মা-বাবার সঙ্গে এসেছে এক নাবালিকা। সে জন্ম থেকেই বোবা। মেয়ে যদি কথা বলতে পারে এই আশা নিয়ে এসেছেন তাঁরা। পঞ্চানন বাবাজী বোবা মেয়ের কাছে গেলেন। তার মায়ের দিকে তাকিয়ে পঞ্চানন বাবাজী বললেন, "চিন্তা করিস না মা। আমার চিকিৎসায় তোর মেয়ে কথা বলবে। মুখে কথার ফুলঝুরি ফুটবে।"

নাবালিকার মাথায় হাত রেখে পঞ্চানন বাবাজী বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লেন এবং দু-তিনবার ফুঁ দিলেন। মাথার পর শরীরের বিভিন্ন স্থান হাত বুলিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। পঞ্চানন বাবাজী অশ্লীল ভাবে গায়ে হাত বোলাচ্ছিল তাতে মেয়েটি অসস্তি বোধ করে। এরপর বাবাজী মেয়েকে মুখ হাঁ করতে বলেন। বোবা মুখ হাঁ করলো। পঞ্চানন বাবাজী তার মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে জিভ ধরে টেনে ধরলেন। নিজের জিভ নাবালিকার জিভে স্পর্শ করলেন। কিছুক্ষন পরে ওর মুখে দু'বার ফুঁ দিয়ে পঞ্চানন বাবাজী আদেশের সুরে বললেন, "বলো মা। বলো বাবা, আব্বা। কিরে বলছিস না কেন? আমার দিকে তাকিয়ে বলো, মা বাবা, আব্বা।"

বেচারি বোবা মেয়েটি চিকিৎসার নামে পাঞ্চনন বাবাজির অশ্লীল আচরণে প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছে। জন্ম থেকে বোবা মেয়েটি হয়তো কিছু বলার জন্য দু-দু বার মুখ হাঁ করলো। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরোলো না। সে ফ্যাল-ফ্যাল দৃষ্টিতে বোবার মত তাকিয়ে রইল এবং তার দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে পঞ্চানন বাবাজী বললেন, "দুঃখ করিস না খুকি। তুই কথা কইবি। আমার গুরুর আশীর্বাদে তোর মুখে কথা ফুঁটবে।"

নাবালিকার মাকে বাবজিকে বললেন, "তোর মাইয়া কথা কইবে। ওকে আগামী মঙ্গলবার আবার এই শিবির নিয়ে

আসবি। আরও তিন বার চিকিৎসা করতে হবে ওকে। তারপর মাইয়ার মুখে বুলি আসবে। দেখবি বোবা মামা, বাবা, আব্বা বলে বলে ডাকবে।” কিছু দূরে একটি গাছের নিচে এক মহিলা তার অন্ধ ছেলেকে নিয়ে বসে আছেন। পঞ্চানন বাবাজী তাঁদের কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, “এই ছেলে কবে থেকে চোখে দেখতে পায় না?”

মহিলা বললেন, “জন্মান্ধ।”

“চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমার কাছে এসেছি। এ ছেলে আমার হাতের স্পর্শে দু’চোখ খুলে সব দেখবেই।” বাবাজী বলেন।

অন্ধ ছেলের দু’চোখে নিজের দু’হাতের বৃষ্ঠাঙ্গুল চেঁপে ধরলেন। আঙ্গুল সরিয়ে দু-বার ফুঁ দিলেন। এবং বাবাজী বললেন, “খোকা চোখ খুলে দেখ। তোর সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে।”

ছেলেটি দু’হাত বাড়িয়ে এদিক ওদিক মাথা ঘোরাতে লাগল। না ও কিছুই দেখতে পারছে না।

এই দেখে পঞ্চানন বাবাজী বললেন, “খোকা জন্ম থেকে অন্ধ। তাই তোর চোখে আলো ফিরতে একটু সময় লাগবে। আমার কাছে আরও কয়েকবার আসবি। আমার মন্ত্র শক্তিতে তুই দু’চোখ ভরে দুনিয়া দেখবি।”

এক যুবতী। কানে কালা। ছোটো বেলায় শুনতে পেত। কিন্তু একটি দুর্ঘটনায় মাথায় চোট পাবার পর থেকে সে

শুনতে পায় না। সে তাঁর মায়ের সঙ্গে এসেছে এই অলৌকিক চিকিৎসা শিবিরে।

যুবতীর মাথায় হাত রেখে পঞ্চানন বাবাজী মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলেন। এরপর দু'হাতে তাঁর দু'কান ধরে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে দু'কান দু-দু বার ফুঁ দিলেন। ঝাড়ফুঁক করার পর বাবাজী জিজ্ঞেস করলেন, “মাইয়া তোর নাম কি?”

মেয়েটি চুপ করে তাকিয়ে রইল। পাশে বসে মা বললেন, “মনে হচ্ছে মেয়ে এখনো শুনতে পাচ্ছে না।”

একটু জোরে আবার পঞ্চানন বাবাজী জিজ্ঞেস করলেন, “নাম কি তোর?” না। মেয়ে কিছুই শুনতে পাইনি। এবং সে বললো, “আমি কোনো কথা শুনতে পারছি না।”

পঞ্চাননের সহযোগী একটি ছোট্ট শিশি মেয়ের মায়ের হাতে দিয়ে বলল, “এতে মন্ত্রপুত জল আছে। রোজ সকালে দু'ফোঁটা করে কানে দিবে। কানে শুনতে পাবে। আগামী মঙ্গলবার মেয়েকে আবার নিয়ে আসবি পঞ্চানন বাবাজীর কাছে।”

এই ভাবে জন্মান্ধ, মূক-বধির, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, থেকে মাথার যন্ত্রণা, যৌনরোগ, বাত, আলসার-সহ যে কোনও রোগগ্রস্তের অলৌকিক চিকিৎসা চলতে লাগলো। মাঝে-মাঝে পঞ্চাননের দুই সহযোগী অরুন ও সুকুমার মাঠে অলৌকিক চিকিৎসা শিবিরে আগত রুগীদের এবং তাঁদের পরিজনদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন,

“আজ যারা পঞ্চানন বাবাজীর এই অলৌকিক শিবিরে দূর-দূরান্ত থেকে আরোগ্য লাভের আশায় এসেছেন। কেউই বাবাজির কৃপা থেকে বঞ্চিত হবেন না। সবার উপর বাবাজীর আশীর্বাদ সূর্য্যের আলোর মত ঝরে পড়বে। বাবার আশীর্বাদে নিজেকে ধন্য করতে দু’হাতে দান বাক্সে দান করতে ভুলবেন না। যে যত বেশি টাকা পয়সা দান করবেন, বাবাজীর কৃপা ও আশীর্বাদ তাঁদের পরিবারের উপর তত বেশি করে ঝরে পড়বে। একশো, হাজার যার যেমন ইচ্ছা দান করুন।”

প্রতি মঙ্গলবার এই অলৌকিক চিকিৎসা শিবির খোলা মাঠে চলে। রোগী এলেই প্রথমে তাকে ১০ টাকার বিনিময়ে একটা পুস্তিকা কিনতে হয়। পরে একটি বাক্সে রোগীকে ইচ্ছে মতো টাকা দিতে বলা হয়। এ ভাবে প্রতি মঙ্গলবার ৮-১০ হাজার টাকা রোজগার হচ্ছে। ইতিমধ্যে পঞ্চানন বাবাজীর এই অলৌকিক শিবিরে এসে অনেক রোগীর মাথা ব্যাথা, হাটু, কোমর, গাঁটে ব্যাথা, অনিদ্রা ইত্যাদি দূর হয়ে গেছে। আমরা লেখা এইটুকু অংশ পড়ার পর হয়তো কেউ ভাবতে পারেন, “সত্যিই কি এভাবে খেলা মাঠের মাঝে পঞ্চানন বাবাজী তাঁর দুই সহযোগী অরুন এবং সুকুমারের সাহায্যে নিয়ে শুধুমাত্র কানে ফুঁ দিয়ে, মাথায়, শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত বুলিয়ে নানা রোগ সারানোর কারবার ফেঁদেছেন?”

হ্যাঁ। সত্যিই। শুধুমাত্র ফুঁ দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে নানা রোগ সারানোর কারবার ফেঁদেছেন এই তিন প্রতারক। জন্মান্ধ, মূক-বধির, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, থেকে মাথার যন্ত্রণা, যৌনরোগ, বাত, আলসার-সহ যে কোনও অসুখ সারিয়ে দেওয়ার দাবি করছেন এই তিন প্রতারক। প্রকাশ্যে এই প্রতারণা চলছে। কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন? এই প্রশ্ন নিয়ে ‘ ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’র ঘাটাল শাখার কর্মকর্তা দেবব্রত আমাকে ফোন করলো এবং বললো, “সন্তোষ দা, তুমি সাংবাদিক। এই অলৌকিক চিকিৎসা শিবির এবং পঞ্চানন বাবাজীর বুজরুকি বন্ধ করতে সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য প্রয়োজন।”

আমি বললাম, “তুই জানিস আমিও যুক্তিবাদী সমিতি’র সংযুক্ত সম্পাদক। তাই জন্মান্ধ, মূক-বধির, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, থেকে মাথার যন্ত্রণা, যৌনরোগ, বাত, আলসার-সহ যে কোনও অসুখ সারিয়ে দেওয়ার দাবি করা এই পঞ্চানন বাবাজী এবং তাঁর বুজরুকি শিবিরের বিরুদ্ধে সব রকম পদক্ষেপ নিতে আমিও তৈরি আছি। কিন্তু এর জন্য সবার আগে প্রমাণ জোগাড় করে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।”

“কিসের প্রমাণ?” দেবব্রত জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, "এই বুজরুকি বন্ধের জন্য অভিযোগ করার আগে প্রমাণ লাগবে। পুলিশের কাছে মুখে বললে হবে না। একটা কাজ কর। তুই পঞ্চানন বাবাজীর অলৌকিক শিবিরে একজন রুগী সেজে চলে যা। পারলে তোকে যখন ফুঁ, স্পর্শ ইত্যাদি করে চিকিৎসা করবে, সেই সময় তোর কোনও বন্ধুকে বলে গোপনে ছবি তুলে নিবি। এর পর তুই নিজে একজন রুগি হিসাবে থানাতে ওই প্রমাণ ছবি সহ অভিযোগ দায়ের করবি। বাকি আমি সাংবাদিক হিসাবে বুজরুকি বন্ধের জন্য পুলিশের সঙ্গে কথা কথা বলব।"

আমরা কথা শুনেই দেবব্রত ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "রুগি সেজে গেলে যদি পঞ্চাননের লোকেরা ধরে ফেলে তাহলে বিপদ হতে পারে।"

আমি বললাম, "তুই কেন বিপদে পড়বি? যারা বুজরুকি ব্যবসা করছে তাঁরা বিপদে পড়বে। তোর দ্বারা যদি এইটুকু না হয় তাহলে ছেড়ে দে। কিছু করতে হবে না।"

"ঠিক আছে যাচ্ছি।" কয়েক ঘন্টা পরে খবর পেলাম যুক্তিবাদী সমিতি'র ঘাটাল শাখা থেকে কয়েকজন সদস্য দাসপুরের গোপালপুর গ্রামের জানাপাড়ায় গিয়ে গোটা ঘটনা গোপনে ভিডিও ক্যামেরাবন্দি এবং ছবি তোলা। এই খবর পাওয়ার পর আমি দেব্রতকে ফোন করে বললাম, "তুই আজই এই প্রমাণের ভিত্তিতে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনকে যুক্তিবাদী সমিতি'র প্যাডে লিখিত অভিযোগ দায়ের কর এবং ওই চিঠি আমার কলকাতার পত্রিকা অফিস ' দৈনিক

বিশ্বমিত্র’-এ ইমেল বা ফ্যাক্স করে পাঠা।” চিঠিতে কি কি লিখতে হবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দিলাম। যুক্তিবাদী সমিতি’র ঘাটাল শাখার তরফ থেকে ঘাটাল মহকুমা শাসককে গোপালপুর গ্রামের জানাপাড়ায় পঞ্চানন মাইতির বুজরুকির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে চিঠি পাঠান হয়। নিচে পুরো চিঠিটি তুলে দিলাম।

প্রতি

১০/৪/২০১২

মাননীয়

মহকমা শাসক মহাশয়

ঘাটাল

মহাশয়,

“...আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’র ঘাটাল শাখার পক্ষ থেকে আপনার কাছে একটি দাবি রাখতে চাই। আমরা দেখলাম গোপালপুর গ্রাম (জানাপাড়া, গ্রাম গোপালপুর, থানা- দাসপুর, জেলা- প: মেদিনীপুর) -এ ‘ফুঁ’ দিয়ে রোগ সরানোর’ নামে একটি অবৈজ্ঞানিক, বেআইনি এবং প্রতারণা মূলক ব্যবসা গত দ’সপ্তাহ ধরে চলে এসেছে। ‘ ড্রাগ এন্ড কমমেটিকস অ্যাক্ট,১৯৪০ অনুসারে এই ধরনের ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে বে-আইনি এবং উক্ত প্রতারক ও এরূপ প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ দোষী বলে অভিযুক্ত হবে এবং তদানুসারে দণ্ডপ্রাপ্ত হবে। এরুপ

প্রতারকদের থেকে সমাজকে বাচাঁতে আপনার কাছে আমাদের দাবি মানুষের অজ্ঞাতাকে নিয়ে এই বে-আইনি ব্যবসাটির বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিন। আমরা ‘ ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’র ঘাটাল শাখার পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছি।”

ধন্যবাদ

দেবব্রত

এই চিঠি পাঠানোর পর দেব্রত জানাল সে আগামী কাল কলকাতায় আসছে। আমার সঙ্গে দেখা করবে। ভালো কথা।

বুধবার ১১ এপ্রিল ২০১২

অলৌকিক চিকিৎসার নামে পঞ্চানন বাবাজী জন্মান্ধ, মূক-বধির, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে শুধু প্রতারণাই নয়, তাঁদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করছে। এই পতারককে জেলে পাঠান উচিৎ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যুক্তিবাদী সমিতি’র অভিযোগের পরেও পুলিশ অভিযুক্ত পঞ্চানন বাবাজী এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ নেয়নি। এই দেখে সন্দেহ হতেই পারে গোপালপুর গ্রামের জানাপাড়ায় বুজরুকি ব্যবসায় পুলিশের অপ্রৎক্ষ সহযোগিতা থাকতে পারে। কারণ, দিনের আলোতে, খোলা মাঠে অলৌকিক শিবির দিনের পরদিন

চলছে। কিন্তু অভিযোগ পাওয়ার পরও পুলিস চুপ মেরে কেন আছে? এই গন্ধটা সন্দেহজনক!

বিকেলে দেব্রত তার স্ত্রীরির সঙ্গে কলকাতার তালতলায় আমার পত্রিকা ' দৈনিক বিশ্বমিত্র' -এর অফিসে এলো। ঘাটালের গোপালপুর গ্রামের জানাপাড়ায় পঞ্চানন বাবাজীর অলৌকিক শিবির নিয়ে অনেকে কথা হল। আমি নিজের নোটপ্যাডে জরুরী তথ্য লিখে রাখলাম। এবং বললাম, "আমি কালকেই বলেছিলাম তুই রুগী সেজে পঞ্চাননের শিবিরে যা। তারপর নিজে একজন রুগী হিসাবে অভিযোগ দায়ের কর। কিন্তু তুইতো আমার কথায় কান দিলি না।"

সে বলল, "বিপদ হতে পারে ভেবে রুগী সেজে ওখানে গেলাম না।"

"কেন? কিসের বিপদ?" জিজ্ঞেস করলাম।

সে বলল, "তোমার কথা মত যুক্তিবাদী সমিতি'র ঘাটাল শাখা থেকে আমি, সুরজিৎ, মানস ও সঞ্জয় চারজনে গোপালপুর গ্রামের জানাপাড়ায় পঞ্চানন বাবাজীর অলৌকিক শিবিরে যাই। গিয়ে দেখি, সম্পূর্ণভাবে অবৈজ্ঞানিক ও বে-আইনিভাবে ফুঁ দিয়ে, রুগীরদের শরীরে অশ্লীলভাবে হাত বুলিয়ে চিকিৎসার নামে দিন-দুপুরে বুজরুকি ব্যবসা চলছে। প্রতারণার এই ব্যবসায় শুধুমাত্র পঞ্চানন এবং তাঁর দুই সহযোগীই নয়, আরও অনেক সমাজবিরোধীরাও যুক্ত আছেন। এই অবস্থায় আমরা যদি

পঞ্চাননের বুজরুকি ব্যবসার সরাসরি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করি তাহলে বিপদ হতে পারে। পঞ্চাননের লোকেরা আমাদের উপর হামলা করতে পারে। তাই আমরা তোমার কথা মত শুধু গোপনে কিছু ছবি তুলতে পেরেছি। যদি আমার কাছে প্রেস কার্ড থাকতো তাহলে পঞ্চাননকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বুজরুকি ফাঁস করে দিতাম। আমার জন্য একটি প্রেস কার্ডের বানিয়ে দাও।”

আমি বললাম, “রুগী সেজে পঞ্চানন বাবাজীর কাছে যেতে তোর ভয় করছে। বিপদ হতে পারে। তাহলে প্রেস কার্ড নিয়ে তাকে কোন সাহসে চ্যালেঞ্জ জানাবি? প্রেস কার্ড পাওয়া এত সহজ কথা নয়। তুই যদি ঠিক মতন কাজ করিস, মিডিয়ার খবরে তোর নাম উঠে আসবে। এবং আমি তো তোর সাংবাদিক বন্ধু। ভেবে বল, পঞ্চানন বাবজীকে পুলিশের হাতে গ্রেফতার করার জন্য কী কী করতে হবে?” না। ও কোনও উত্তর দিতে পারলো না। ভেবেছিল আমার কাছ থেকে প্রেস কার্ড পাওয়া যাবে। কিন্তু না শুনে ওর ভালো লাগেনি। তাই হতাশ হয়ে ফিরে গেল। এরপর পত্রিকা অফিসে থেকে যুক্তিবাদী সমিতি’র সভাপতি প্রবীর ঘোষকে ফোন করে সব কথা বলল। শুনেই প্রবীর বাবু রেগে গিয়ে বললেন, “ও একটা কাজ দিতে ঠিক মতন করতে পারে না। আবার প্রেস কার্ড নিয়ে ওকি ঘোড়ার ডিম করবে? তুমি ওর সম্পর্কে আমাকে কিছু বললে না। একটি

প্লান বানিয়ে ওকে বোঝাও কি করে পঞ্চাননকে জালে ফাঁসান যায়। কারণ তুমিও যুক্তিবাদী সমিতি'র একজন পদাধিকারী। তুমিও আমার সঙ্গে অনেক অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের বুজরুকি ফাঁস করছো। আমি দেখতে চাই তোমার নেতৃত্বে পঞ্চানন বাবাজীর অলৌকিক শিবিরের বুজরুকি ফাঁস হোক। সংবাদ মাধ্যমের শক্তি প্রয়োগ করে এই অভিযুক্ত প্রতারকদের পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করে দেখাও।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। প্লান বানিয়ে কাজ শুরু করছি। গোপালপুর গ্রামের জানাপাড়ায় পঞ্চানন বাবাজীর অলৌকিক শিবির নিয়ে যে তথ্য ও অভিযোগ পেয়েছি তার ভিত্তিতে একটি খবর আমার পত্রিকায় লিখে দিচ্ছি। তার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা করব।"

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় দাসপুরের গোপালপুর গ্রামের জানাপাড়ায় অলৌকিক শিবিরে ফুঁ দিয়ে, স্পর্শ করে রোগের চিকিৎসা নামে বুজরুকি চলছে। অন্যদিকে, খড়গপুরের বাঁশপতির গ্রামে যুগল মাহাত নামক এক বাবাজী নিজের মাথার ঘাম দিয়ে যে কোনও অসাধ্য রোগের চিকিৎসা করে রুগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে। কিন্তু এই প্রতারকের বিরুদ্ধে পুলিশ বা প্রশাসন কোনও ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি।

শুক্রবার ১৩ এপ্রিল ২০১২

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের নাকের ডগায় কোথায় বা ফুঁ দিয়ে তো কোথাও মাথার ঘাম দিয়ে বুজরুজি চিকিৎসা চলছে। এই বুজরুকদের খপ্পড়ে পরে অনেক অসহায় রুগী ও মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন। কিন্তু জানিনা কোন সম্মোহনে পুলিশ ও প্রশাসন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে? কিন্তু আমরা সাংবাদিক কলম দিয়ে আঘাত করে এঁদের ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে চলেছি। তাই আজ আমার পত্রিকা ‘ দৈনিক বিশ্বমিত্র ’-তে গোপালপুর গ্রামে পঞ্চানন বাবাজীর ফুঁ দিয়ে এবং খড়গপুরে যুগল মহাতোর মাথার ঘাম দিয়ে বুজরুকি চিকিৎসার খবর চার কলম জুড়ে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। ‘ কোথাও বা ফুঁ দিয়ে তো কোথাও মাথার ঘাম দিয়ে চিকিৎসার ব্যবসা ’ এই শিরোনামে আমার লেখা খবর প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকের সামনে এই খবরের একাংশ তুলে ধরছি।

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ এপ্রিল (নি.প্র.)। আজ এই বাংলা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক বিকশিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নিত্যদিন নতুন-নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। রাজ্য বাসীদের মধ্যে যেমন বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ বাড়ছে, সেখানে অনেক অন্ধবিশ্বাস জনগনের মন-মস্তিস্ক থেকে দূর হয়ে চলেছে। এটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের একটি অংশের ছবি। অন্য অংশের ছবিটি হল, আজও

অনেক মানুষ ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র, ভূত-পেত্নি, ওঝা- তান্ত্রিক, অলৌকিক, গুলগল্পে বিশ্বাস করেন। এবং এই সবের সুযোগ নিয়ে এই বাংলায় ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র, ওঝা-তান্ত্রিকের বুজরুজি ব্যবসা ফুলেফেঁপে রয়েছে। আজও তথাকথিত ওঝা, তান্ত্রিক, বাবাজী-মাতাজী ঝাড়ফুঁক করে যে কোনও রোগের চিকিৎসা করার দাবি জানাচ্ছেন। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে বিভিন্ন স্থানে ফুঁ বা মাথার ঘাম দিয়ে বুজরুজি চিকিৎসা চলছে।

"কোনো দেশ কে ধ্বংস করতে চাইলে দেশের মানুষকে ধর্মের নামে লড়াই লাগিয়ে দিন.. দেশ এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাবে...."

-লিও টলস্টয়

বিক্রমপুর কেন অগ্রসর?

-মজিব রহমান

অগ্রসর এলাকা হিসেবে বিক্রমপুরের আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। লর্ড কারমাইকেলের চোখে বিক্রমপুর ছিল স্কটল্যান্ডের মতো। লর্ড কার্জন বিক্রমপুরবাসীর কর্মদক্ষতা সম্পর্কে বেশ অবগত ছিলেন বলেই দাবি করেছেন। তিনি বলেছিলেন, এডিনবরা যেমন ইউরোপের মধ্যে তেমনি বিক্রমপুর ভারতবর্ষের মধ্যে সেরা। ইংল্যান্ডের এডিনবারর সাথে বিক্রমপুরের তুলনা হতো দক্ষ প্রশাসকসহ খ্যাতিমান মানুষদের জন্মস্থান হিসেবেই। কিন্তু কোন কোন মানুষদের কারণে এগিয়ে গিয়েছিল বিক্রমপুর? সেই অনুসন্ধান করে বিস্মিতই হয়েছি। মূলত বিক্রমপুরের মানুষেরা ছিল বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তায় অগ্রসর। আমার মনে হয়েছে ভারতের যে কোন অঞ্চলের চেয়ে বিক্রমপুরের মানুষ প্রগতিশীল। শুধু এ কারণেই বাংলাদেশের ৬৩ জেলায় মৌলবাদীরা একযোগে বোমা হামলা করতে পারলেও একমাত্র মুন্সিগঞ্জে পারেনি। কলকাতা কেন্দ্রিক যে নবজাগরণ তৈরি হচ্ছিল তার পেছনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন বিক্রমপুরের মানুষেরাই। যখন ব্রাহ্ম ধর্ম তৈরি হল তার নেতৃত্ব দিয়েছেন আবার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী রাঢ়ীখালের স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসুর কোন ধর্মীয় অনুরাগ ছিল না। তাঁর স্ত্রী তেলিরবাগ গ্রামের অবলা বসু ছিলেন কলকাতার অন্যতম সেরা সমাজসংস্কারকদের একজন। কলকাতা কেন্দ্রিক নবজাগরণে অবলা বসু ও তাঁর ভাই বাংলার এটর্নি জেনারেল সতীশরঞ্জন দাশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সতীশরঞ্জন দাশ গলার টনসিল অপারেশনের জন্য ১২ বছর বয়সে বিলেত গিয়ে সেখানেই পড়াশোনা করে ব্যারিস্টার হয়ে আরো ১২ বছর পরে দেশে ফিরেন। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা আইনজীবী। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হাঁসাড়া গ্রামের সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের পিতা ব্যারিস্টার সুধীর রায় ছিলেন তাঁর জুনিয়র। তিনি ইংরেজদের ধাচে জীবন যাপন করতেন। তিনি বৃটিশদের ধাঁচে ভারতে দ্য দুন আবাসিক পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা এখনো ভারতের অন্যতম সেরা স্কুল। এই দুন স্কুলে বিক্রমপুরের অবদান নিয়েই একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করা যায়। ভারতের রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতিতে এই স্কুলের প্রাক্তণ ছাত্রদের বিশেষ অবদান রয়েছে। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. রাজীব গান্ধীও ছিলেন দুন স্কুলের ছাত্র। এমনকি তার প্রশাসনে এই স্কুলের ছাত্রদের প্রাধান্য থাকায় একে ‘দুন মন্ত্রিপরিষদ’ও বলা হতো। ভারতের

প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুজন সাহিত্যিক বিক্রম শেঠ ও অভিতাভ ঘোষ, প্রখ্যাত শিল্পী অনিশ কাপুরসহ অসংখ্য কৃতীসন্তান রয়েছেন এ স্কুলের ছাত্র। সতীশরঞ্জনের এক নাতি শমী দাশও এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। তাঁর বোন সরলা রায় প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর স্বামী দার্শনিক প্রসন্নকুমার রায় কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম ভারতীয় প্রিন্সিপাল ছিলেন।

এই পরিবারটির অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে কলকাতা বিনির্মাণে। সতীশরঞ্জন দাশের পিতার নাম দুর্গামোহন দাস। তিনি ছিলেন একজন আলোকিত মানুষ। যদিও তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন। দুর্গামোহন স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বিখ্যাত সঙ্গীতস্রষ্টা অতুলপ্রসাদ সেনের বিধবা মা হেমন্তশী সেনকে বিবাহ করেন। তখন ভারতে হিন্দু বিধবাদের বিবাহের জন্য প্রচেষ্টা চলছিল। তিনি আরেকটি বৈপ্লবিক কাজ করেন যা কলকাতায় আলোড়ন তুলে; তা হল- নিজের অল্পবয়স্কা বিধবা সৎমার বিবাহ দেন। এসব আলোচিত ঘটনা ঘটানো সহজ ছিল না। এই পরিবারের সবচেয়ে উজ্জ্বল মুখ হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি সতীশরঞ্জন দাসের কাকা ভুবন মোহন দাশের ছেলে। ভারতের মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া ও সমস্যা

নিয়ে তিনিই চিন্তা করেছিলেন। মুসলিমদেরও প্রিয় নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে আবুল কালাম আজাদ মন্তব্য করেছিলেন, 'দেশবন্ধু অকালে মারা না গেলে দেশে নতুন অবস্থা সৃষ্টি করতেন'। তিনি মৃত্যুবরণ না করলে ভারত বিভক্তি রদ হতো বলেও অনেকে মনে করেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকার্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেন, 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ। মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান'।

পর্ব ২

চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবার শিক্ষিত প্রগতিশীল হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিল। তাঁর পিতা কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নী ছাড়াও 'ব্রাহ্ম জনমত' পত্রিকার সম্পাদক হওয়ায় কলকাতার সাংবাদিক জগতেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতামহও ছিলেন সরকারি আইনজীবী। তাদের পরিবারে তিনজন ছিলেন জজ ও বেশ কয়েকজন আইনজীবী ছিলেন। এই পরিবারের ব্যাপ্তী খুবই ব্যাপক। বিক্রমপুরের সেরা দুটি পরিবারের একটি দাশ পরিবার। সরলা দাশের নাতি রেণুকা রায় কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভারতের মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি অল ইন্ডিয়া উইমেন কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর ভাই সুব্রত মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রথম প্রধান মার্শাল। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জওহরলাল নেহেরুর বোন ও জাতিসংঘের প্রথম নারী সভাপতি বিজয়া লক্ষ্মী পণ্ডিতের ভাগ্নি শারদা মুখার্জীকে বিয়ে করেন। সে হিসেবে পরিবারটি নেহেরু/গান্ধী পরিবারের আত্মীয়। তার আরেক ভাই প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় রেল বোর্ডের চেয়ারপারসন। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের নাতনি ভায়োলেটকে বিয়ে করেছিলেন। তার ছোটবোন নীতা সেনের মেয়ে গীতি সেন খ্যাতনামা শিল্প ইতিহাসবিদ। গীতি সেন বিয়ে করেছিলেন প্রখ্যাত বলিউড চলচ্চিত্র পরিচালক মোজাফফর আলীকে।

ভারতের প্রধান বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাশও তাদের পরিবারের একজন। তাঁর পুত্র সুরঞ্জন দাশ ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন। ভারতের কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী সোনারং গ্রামের অশোক কুমার সেন তাঁর কন্যা অঞ্জনা দাশের স্বামী। অশোক কুমার সেনকে ছাড়া দীর্ঘকাল ভারতের আইনমন্ত্রীর পদে অন্য কাউকে ভাবাই যেতো না। অশোক সেন ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আসনটি ধরে রেখেছিলেন। পরে তিনি রাজ্যসভার সদস্যও হন। নেহেরু মন্ত্রী সভায় তিনি ১৯৫৭-৬৬ এবং রাজিব গান্ধীর মন্ত্রী সভায় ১৯৮৪-৮৭ আইন ও বিচার মন্ত্রী হন। এ ছাড়া তিনি যোগাযোগ, ইস্পাত ও খনি মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর লোকসভার আসন জয়ের রেকর্ড রয়েছে এবং তিনি সাত প্রধানমন্ত্রীর সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশনেরও

সভাপতি ছিলেন। তারই ভাই সুকুমার সেন ১৯২১ সালে আইসিএস কর্মকর্তা ও ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যসচিব হন। এ পদে থাকা অবস্থাতেই প্রেষণে ১৯৫০ সালে তাঁকে স্বাধীন ভারতের প্রথম 'মুখ্য নির্বাচন কমিশনার' পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি অসামান্য দক্ষতার সাথে বিশাল ভারতের প্রথম দুটি জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা করে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৫৮ পর্যন্ত (চাকরিকাল) দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আন্তর্জাতিক ইলেকশন কমিশনের সভাপতিরূপে সুদান ও নেপালের সাধারণ নির্বাচন পরিচালন করে অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাদের আরেক ভাই অমীয় কুমার সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগী, চিকিৎসক ও শ্রুতি লেখক ছিলেন। তাদের পিতা অক্ষয় কুমার সেনও ছিলেন ভারতের আইসিএস কর্মকর্তা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

সোনারং এর সেন পারিবারও ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। এই পরিবার ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রসর পরিবার। এ পরিবারের সবচেয়ে খ্যাতিমান পুরুষ হলেন অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন। অমর্ত্য সেনের পৈতৃক বাড়ি মানিকগঞ্জে কিন্তু অমর্ত্য সেনের জন্ম শান্তিনিকেতনে মাতামহ সোনারং গ্রামের ক্ষিতিমোহন সেনের 'পর্ণকুটীরে'। অমর্ত্য সেনের পিতা আশুতোষ সেন ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।

ক্ষিতিমোহন ছিলেন তিনি চম্বা রাজ্যের শিক্ষা সচিব। রবীন্দ্রনাথের আহবানে তিনি শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতীর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগদান করেন এবং বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ রূপে কর্মজীবন শেষ করেন। কিছুদিন তিনি বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্যের পদেও আসীন ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে বেশ কয়েকবার ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও ১৯২৪ সালে চীন ভ্রমণে সফরসঙ্গী হয়েছেন। তিনি মধ্যযুগের সন্তদের বাণী, বাউল সঙ্গীত ও সাধনতত্ত্¡ নিয়ে গবেষণা ও সংগ্রহে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছরের চেষ্টায় সংগৃহীত বিষয়সমূহ কয়েকটি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বভারতী নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ও সচিব ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্যক রসজ্ঞ ও টীকাকার। তাঁর স্ত্রী কিরণবালা সেন শান্তি নিকেতন থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা শ্রেয়শী'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র ক্ষেমেন্দ্র মোহন সেন রবীন্দ্র সংস্কৃতির প্রচারক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা অমিতা সেনের পুত্র নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। অমর্ত্য সেনের কন্যা লেখক ও অভিনেত্রী নন্দনা সেনের স্বামী প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইনের চেয়ারম্যান ও সিইও জন ম্যাকিনসন। অমর্ত্য সেনের স্ত্রী নবনীতা দেবসেন পদ্মশ্রী প্রাপ্ত ভারতের একজন কবি, লেখক ও শিক্ষাবিদ। উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা লেখক সত্যেন সেন ও রাষ্ট্রদূত বিনয় রঞ্জন সেনও

এই পরিবারের সন্তান। বিনয় রঞ্জন সেন ছিলেন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এশিয়ার প্রথম মহা পরিচালক। সত্যেন সেন সাংবাদিক ও লেখক হিসেবেও খ্যাতিমান। তাঁর পিতা প্রত্নতত্ত্ব চর্চা করতেন এবং এ বিষয়ে পত্রিকায় লিখতেন। তাঁর ঠাকুরদা ডাক্তার ভুবনমোহন সেন এর ছেলে ক্ষিতিমোহন সেন। সত্যেন সেনের ছোট ঠাকুরদা সংস্কৃতের শিক্ষক ও সংস্কৃত ভাষার কবি ছিলেন। আরেক কাকা মনোমোহন সেন ছিলেন শিশু সাহিত্যিক।

পর্ব ৩

চিত্তরঞ্জন দাশ জাত-পাত বৈষম্য মানতেন না। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ পছন্দ না করে, নারীমুক্তি সমর্থন করে, নারীশিক্ষা ও বিধবাদের পুনর্বিবাহকে উৎসাহিত করতেন। শুধু মুখে নয়, তিনি অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে থেকে নিজ কন্যাদের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারে বিবাহ দিয়েছেন।

ব্যারিস্ট্রার সুধীর রায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জুনিয়র হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনিও দেশবন্ধুর সাথে কংগ্রেসের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের প্রভাবশালী একজন সদস্য। দেশবন্ধুর চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা অপর্ণা দেবীকে বিয়ে করেন। তাদেরই পুত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়। এই রায় বংশের চন্দ্রশেখর রায়ের নামেই শেখরনগরের নামকরণ। এই

পরিবারের রায়বাহাদুর শ্রীনাথ রায়ের নামে ওখানে একটি হাইস্কুল রয়েছে। তাঁরই আমন্ত্রণে ১৯১৫ সালে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল এসে শেখরনগর ও হাঁসাড়ায় দুটি দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধন করেন। বিক্রমপুরের দাশ, সেন ও রায় পরিবারের মধ্যে একটি আত্মীয়তার বন্ধনও তৈরি হয়েছিল। বিক্রমপুরের অধ্যাপক শাহজাহান মিয়ার পরিবার আরেকটি অগ্রসর পরিবার। এ পরিবারের সুসন্তানরা খৃষ্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ ও হিন্দু পরিবারের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

বিক্রমপুরের আরেকটি বিখ্যাত পরিবার মালখানগরের বসু পরিবার। এই পরিবারের সন্তান ত্রিশ দশকের বিখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু। তাঁর কবিতায় বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এসেছে বারবারই। তাঁর কবিতায় রয়েছে— প্রেমের শরীরী সৌন্দর্যতা ও কামনার মুক্তি লাভের ব্যাকুলতা। তিনি বিয়ে করেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ও ঔপন্যাসিক হাঁসাড়া গ্রামের রানু সোম (প্রতিভা বসু) কে। বিক্রমপুর জুড়ে অনেক বসু পরিবার ছিল। তারমধ্যে শ্রীনগরের লালা কীর্ত্তিনারায়ন বসু শ্রীনগরের জমিদার ও মীর কাশিমের গভর্নর ছিলেন। রাজানগরের সমরেশ বসু ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিও তীব্র প্রগতিশীল ও মুক্তমনা ছিলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়েসে প্রেম করে বিয়ে করেন বন্ধুর স্বামী পরিত্যাক্তা ২২ বছরের বোনকে। তাঁর রচনার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে মামহা হয়েছিল।

লেখক খ্যাতি রয়েছে হালের চিকিৎসাবিজ্ঞানী পূরবী বসুরও। পূরবী বসুর স্বামী জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত বাংলাদেশের খ্যাতিমান ছোটগল্পকার। পুরবী বসু স্বামীর 'দত্ত' পদবী গ্রহণ করেননি। মুন্সিগঞ্জ শহরের পূরবী বসুদের প্রতিবেশি বিমান বসু পশ্চিমবঙ্গ বাম ফ্রন্টের চেয়ারম্যান। তাঁর ভাই তুষারকান্তি বসু ছত্রিশগড় থেকে প্রকাশিত দণ্ডকারণ্য সমাচার নামে একটি দৈনিক হিন্দি পত্রিকা প্রকাশ করে এর প্রধান সম্পাদক হন। কবি ও শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসুর পরিবারটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাই প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুকোমল বসু ও বোন মঞ্জুলিকার পুত্র সুসাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। বুদ্ধদের গুহর বাবলি উপন্যাসের বিরুদ্ধেও অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল। সাহিত্যিক-সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র বসু তাঁর পিতামহ এবং বিপ্লবী ও সাহিত্যিক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ছিলেন তাঁর মাতামহ। গিরিশচন্দ্র বসু নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে দারোগাগিরিরি অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেন ‘সেকালের দারোগা কাহিনী’। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের সংবাদপত্র জগতের অগ্রদূত ছিলেন। ১৮৪৬ সালে সাপ্তাহিক হিন্দু ইন্টেইলজেন্সার পত্রিকা প্রকাশ করেন। বঙ্গদেশে এটা ছিল সর্বপ্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র এবং এটিতেই সবার আগে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হয়েছিল। বিচারপতি চন্দ্র মাধব ঘোষ, ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ ও ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষ তাঁর মামাতো ভাই।

চন্দ্র মাধব ঘোষ ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম বাঙালি বিচারপতি এবং পরবর্তীতে তিনি প্রধান বিচারপতিও হন। চন্দ্র মাধব ঘোষের পিতা ছিলেন বাংলার ডেপুটি কালেক্টরদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি রায়বাহাদুর খেতাব অর্জন করেন। চন্দ্র মাধবের বড় পুত্র এডভোকেট যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রায়বাহাদুর হয়েছিলেন। চন্দ্র মাধব ঘোষের আরেক পুত্র সতীশচন্দ্র ঘোষও ছিলেন নামকরা উকিল। তাঁর ছেলে অরুণকুমার ঘোষও বার-অ্যাট ল। চন্দ্রমাধবের এক দৌহিত্র অশোককুমার রায়ও ছিলেন ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ প্রথম ব্যাচের ভারতীয় ইংরেজি শিক্ষিত কর্মকর্তা ও সমাজ-সংস্কারক, কৃষ্ণনগরের সদর-অলা, ঢাকা কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। মনোমোহনই প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার হিসেবে ১৮৬৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে প্রচুর ভূমিকা রাখেন। বেথুন কলেজের সুপারিনটেন্ডেন্ট রূপে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহপাঠী ও ঘণিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর ছোটভাই অসাধারণ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ১৮৮০ সালে ব্যারিস্টার হন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ’ মহাকাব্য ইংরেজি অনুবাদ করেন, ১৯০৫ সালে তিনি জাতীয় মহা

সমিতির সভাপতি হন এবং তিনিই কংগ্রেস নেতা হিসেবে সর্বপ্রথম বাঙ্গালিকে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ঘোষ পদবীধারীদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগরখ্যাত কালীপ্রসন্ন ঘোষ লেখক, সম্পাদক ও ভাওয়াল রাজার দেওয়ান হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। কুমারভোগ গ্রামের বিখ্যাত বিপ্লবী মার্ক্সিস্ট জিতেন ঘোষ লেখক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বহর গ্রামের সুবোধ ঘোষও লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। শ্রীনগরের সুকুমার রঞ্জন ঘোষ মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের এমপি ছিলেন। তিনি একাধারে রাজনীতিবিদ, সিনেমা নির্মাতা ও ওষুধ ব্যবসায়ী। তারা সকলেই প্রগতিশীল মানুষ।

পর্ব ৪

কনকসার গ্রামের সরোজিনী নাইডুর পরিবারও বিখ্যাত পরিবার। তাঁর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ— ছিলেন হায়দরাবাদের নিজাম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও হায়দরাবাদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সদস্য। সরোজিনীর মা ছিলেন বাংলা ভাষার একজন অগ্রগণ্য কবি। তাঁর ভাইদের মধ্যে বীরেন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কমিউনিস্ট বিপ্লবী যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্লিন কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্রের অন্যতম

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব যাকে সোভিয়েত সিক্রেট পুলিশ হত্যা করে। সরোজিনীর ছোট বোন মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে অধ্যয়ন করেন স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন ও ট্রাইপস লাভ করেন। মৃণালিনীও একমাত্র ভারতীয় নারী হিসেবে জার্মানিতে গিয়ে সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। তাঁর অপর ভাই হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট নাট্যকার, কবি ও অভিনেতা। সরোজিনী ব্রাহ্মণ কন্যা হলেও মাত্র ১৭ বছর বয়সে অব্রাহ্মণ ড. মুথ্যালা গোবিন্দরাজুলু নাইডুর প্রেমে পড়েন। ১৯ বছর বয়সে পড়াশোনা সমাপ্ত করে অসবর্ণ বিয়ে করে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর চার সন্তানের মধ্যে এক কন্যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী পদ্মজা নাইডু পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন।

শ্যামসিদ্ধি গ্রামের হরি আনন্দ বাড়রীও হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন। তিনি অবশ্য ভারতের গোয়েন্দা পুলিশ প্রধানও ছিলেন। তাঁর কন্যা রাধারানীর স্বামী কনকসার গ্রামের পিনাকরঞ্জন চক্রবর্তী বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং পরবর্তী কালে তিনি ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হন। বর্তমানে তিনি ভারতের বেসরকারি থিঙ্কট্যাঙ্ক অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ফেলো। বিক্রমপুরের আরো অনেকেই রাষ্ট্রদূত হয়েছেন। আমিনুর রহমান শামসুদ দোহা যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, ইরান ও তুরস্কর রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি এরশাদ সরকারের

পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন। তাঁর পিতা শরিষাবন গ্রামের আবু হামিদ মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা প্রথম ভারতীয় হিসেবে ডেপুটি কমিশনার হন। ভারত ভাগের পরে প্রথম মুসলিম হিসেবে ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গ পুলিশের আইজি হন। এরপর আইয়ুব খান সরকারের কেন্দ্রীয় খাদ্য, কৃষি ও পূর্ব দপ্তরের মন্ত্রী হন। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও বাহমার হাইকমিশনার ছিলেন। ষোলঘরের কামরুদ্দিন আহমদ বার্মার রাষ্ট্রদূত এবং কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন। সোনারং গ্রামের বিনয় রঞ্জন সেন আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রথম ভারতীয় মহাপরিচালক ছিলেন। বিএনপির মন্ত্রী এম. শামসুল ইসলাম ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এরা সকলেই মননে ও চেতনায় ছিলেন প্রগতিশীল।

সিরাজদিখানের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলায় শীর্ষস্থানীয়। তিনি আন্তর্জাতিক ফ্যামে কাজ করার জন্য যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখনই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তীব্রভাবেই মার্ক্সিশিস্ট ও বস্তুবাদী ছিলেন। তাঁর লেখাতেও সাধারণ মানুষের জীবন উঠে এসেছে। তীব্র প্রথাবিরোধী লেখক ছিলেন শ্রীনগরের ড. হুমায়ুন আজাদও। আহমদ শরীফের পরে তিনিই প্রগতিশীলতার পক্ষে লিখছিলেন জোরালোভাবেই। কিন্তু মৌলবাদী অপশক্তি তাকে হত্যা করে। তবে শ্রীনগরের লেখক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরেকজন দেশবরেণ্য

প্রগতিশীল লেখক। লৌহজং এর ইমদাদুল হক মিলনও ঔপন্যাসিক হিসেবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সিলেটে মৌলবাদীদের হাতে নিহত নুরজাহানকে তুলে আনেন বিক্রমপুরের প্রেক্ষিতে এবং মৌলবাদীদের অপরাধের একটি দলিল রচনা করেন। শ্রীনগরের ফয়েজ আহমেদ প্রসিদ্ধ ছড়াকার হলেও তিনি পত্রিকায় কলাম লিখেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রগতিশীল আন্দোলনের সারাদেশেরই শীর্ষস্থানীয় একজন। তিনি একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচারের আওতায় আনার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন এবং তাদের একটি নমুনা বিচারের তিনি বিচারকের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ছিলেন। লৌহজং এর নূহ-উল-আলম লেনিন প্রগতিশীল রাজনীতি করে এসেছেন। তিনিও গবেষক ও লেখক হিসেবে প্রগতির পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে গবেষণাও করেছেন।

পর্ব ৫

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সাধারণত প্রগতিশীল মানুষই থাকেন। দেশবরেণ্য দুজন নৃত্যশিল্পীর দুজনেরই বাড়ি বিক্রমপুরে। সিরাজদিখানের গওহর জামিল যিনি রওশন জামিলকে বিয়ে করার জন্য গণেশ নাগ থেকে ধর্মান্তরিত হলেও তিনি কখনোই প্রগতিশীলতা ছাড়েননি। তিনি বাংলাদেশের নৃত্য

শিল্পের একজন পথিকৃৎ। দেশে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতা যেমন আব্দুল জব্বার খান, শিশুশিল্পী তাঁরই পুত্র মাস্টার জুলু তেমনি প্রথম নৃত্য পরিচালকও বিক্রমপুরের—গওহর জামিল। সেই পথ ধরেই টঙ্গিবাড়ির লায়লা হাসান রোজি হয়ে উঠেন নৃত্যশিল্পের আরেক দিকপাল। তাঁর স্বামী হাসান ইমামও একজন বরেণ্য সাংস্কৃতিক কর্মী যিনি পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রচর্চা বন্ধের বিরুদ্ধে ও বাংলাদেশে মৌলবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। চারণ কবি মুকুন্দু দাশ, 'একবার যেতে দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পড়বে ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। এ গান ব্রিটিশদের বুক কাঁপিয়ে দিতো। হালে শাহ আলম সরকার বাউল শিল্পী হিসেবে দেশবরেণ্য হয়ে উঠেন। তাঁর পালাগান সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে ভূমিকা রাখে। তাঁর গান গেয়েই শিল্পী মমতাজ খ্যাতি লাভ করেন। সংগীত শিল্পী হিসেবে ভারতজোড়ে খ্যাতি লাভ করেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও হালের শ্রেয়া ঘোষাল। শ্রীনগরের শিমুল ইউসুফ ও তাঁর স্বামী নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। শিমুল ইউসুফ গান ও অভিনয়ে সমান পারদর্শী ছিলেন।

সব ধরনের সঙ্গীতেই বিক্রমপুরের মানুষের বিশেষ অবদান রয়েছে। লোক সংগীত, পালাগান, আধুনিক গান সব ক্ষেত্রেই তাদের অবদান অনেক। বাউল শিল্পীদের মধ্যে আরো ছিলেন আবুল সরকার, যিনি সারাদেশেই খ্যাতি

অর্জন করেন। মুকুন্দু দাস ও কালাচাঁদ দাস কুন্ডু কীর্তন পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেন। শ্যামসিদ্ধি গ্রামের নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় সব ধরনের গান করলেও কীর্তনীয়া হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তিনি প্লে-ব্যাক সিঙ্গারও ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত কৌতুক অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গান শিখেছেন সংগীত শিল্পী মালখানগরের উমা বসু ও হাঁসাড়ার প্রতিভা বসু। প্রতিভা বসু নজরুলেও ছাত্রী ছিলেন। তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাহাত্মা গান্ধী উমাকে নাইটিংগেল উপাধি দেন। সীমান্ত গান্ধী খ্যাত খান আব্দুল গফফার খান ও সুভাষচন্দ্র বসু উমার গানের ভক্ত ছিলেন। সন্তোষ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতির শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ভারত সরকারের গীতশ্রী উপাধী প্রাপ্ত সাবিত্রী ঘোষ বহু সিনেমাতেও কণ্ঠ দিয়েছেন। লৌহজং এর বাহেরক গ্রামের মেয়ে কলকাতার আধুনিক গানের একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হলেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ‘একটা গান লিখো আমার জন্য’, ‘জলে ভাসা পদ্ম আমি’, ‘বড় সাধ জাগে একবার তোমায় দেখি’ এর মতো গান তিনি গেয়েছেন। টঙ্গিবাড়ির মুজিব পরদেশি ও মুন্সিগঞ্জ সদরের জহির আহমেদ সারাদেশব্যাপীই জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তাদের গান এখনো সংগীতপিপাসুরা পছন্দ করেন। শিমুল ইউসুফ শুরুতে খ্যাতি অর্জন করেন গান গেয়েই। পরবর্তীতে তিনি

মঞ্চে অভিনয় করেই খ্যাতি পান। অভিনয় জগতে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন নায়িকা হিসেবে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশে কৌতুক অভিনেতা হিসেবে টেলি সামাদ ও নারায়ণ চক্রবর্তী খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়া নাজমা আনোয়ার, আব্দুল জব্বার খান, দোয়েল, আব্দুল কাদের খ্যাতিমান ছিলেন। পপ সংগীতের অন্যতম গায়ক ফেরদৌস ওয়াহিদ নায়ক হিসেবেও অভিনয় করেন। তাঁর পুত্র হাবিব ওয়াহিদও খ্যাতিমান সঙ্গীত শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার। এ সময়ের বালাম ও তাহসানও বিক্রমপুরের। তাহসান অভিনয় করেও খ্যাতি অর্জন করেন। সিনেমা পরিচালনাতেও আলোচিতদের কয়েকজন হলেন আব্দুল জব্বার খান, চাষী নজরুল ইসলাম, আলমগীর কুমকুম, শফী বিক্রমপুর, নুর হোসেন বলাই। গীতিকার ও সুরকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন আলাউদ্দিন আলী ও সরদার আলাউদ্দিন আহমেদ।

চলচ্চিত্র অঙ্গনেও বিক্রমপুরের মানুষের বিপুল অবদান রয়েছে। আবদুল জব্বার খানকে বাংলা চলচ্চিত্রের জনক বলা হয়। তিনি মুখ ও মুখোশ চলচ্চিত্র নির্মাণ করে ঢাকায় এর দুয়ার খুলে দেন। স্বাধীনতার পরে পরিচালক হিসেবে আসেন চাষী নজরুল ইসলাম। তাঁর ‘ওরা ১১ জন’ মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য দলিল। আলমগীর কুমকুম ও নুর হোসেন বলাইসহ বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক বিক্রমপুরের। অভিনয়ে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের

শীর্ষ জনপ্রিয় অভিনেত্রী। উত্তম কুমারের সাথে তাঁর জুটি বহু হিট সিনেমা উপহার দিয়েছে। আলাউদ্দিন আলী ও শাহ আলম সরকার অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কৌতুক অভিনেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' নামের সিনেমা করে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অবদান রাখেন। প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনেও ভূমিকা রাখেন।

চিত্র শিল্পে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন সারদা উকিল, বরোদা উকিল, রণদা উকিল, শান্তনু উকিল, মুকুল দে, আব্দুল হাই, অতুল চন্দ্র বসু, কাজী আব্দুল বাসেতসহ অনেকে। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনটাও বিক্রমপুরের মানুষ আলোকিত করে রেখেছেন। তাদের প্রগতিশীলতার আলোয় আলোকিত হয়েছে ঢাকা থেকে কলকাতা তথা সারা বাংলা! (চলবে)

"Men are mortal. So are ideas. An idea needs propagation as much as a plant needs watering. Otherwise both will wither and die."

-B. R. Ambedkar

নরেন্দ্র দাভেলকর: যুক্তিবাদী শপথের আরেক নাম

- দেবস্মিতা

সবে আলো ফুটেছে। ঘুম ভাঙেনি শহরটার। এক প্রৌঢ় বেরিয়েছেন হাঁটতে। শান্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করছেন আর ভাবছেন কীভাবে পৃথিবীকে সকালের মতো এতো সুন্দর, স্নিগ্ধ রাখা যায়। ধর্মে ধর্মে হানাহানি সরিয়ে মনুষ্যত্ব জেগে উঠুক সকলের মধ্যে। এমন সময় পরপর দুটো গুলির আওয়াজ। ভাবনা সব মিলিয়ে গেল। হেরে গেলেন মানুষটা। গুলি যে তাঁকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছিল। নরেন্দ্র দাভেলকর। নামটা শুনেই বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো? কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে যাঁরা গর্জেছেন তাঁদের তো বরাবর কিছু না কিছু মাশুল দিতে হয়েছে। ইনি দিলেন নিজের জীবনটাই।

দিনটা ছিল ২০১৩ সালের ২০ অগস্ট। পুণেতে বাড়ির কাছেই খুন হন ৬৭ বছরের যুক্তিবাদী ও সমাজকর্মী নরেন্দ্র দাভেলকর।

মাথায় গুলি করে তাঁকে খুন করে দুষ্কৃতীরা। পেশায় দাভেলকর ছিলেন চিকিৎসক আর নেশায় যুক্তিবাদী। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন মহারাষ্ট্রে। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে সমাজকর্মী হিসাবে সম্পূর্ণভাবে

নিয়োজিত করেন দাভেলকর। “বাবা আদভ” এর “এক গাঁও এক পানোঠা” আদর্শে (One village – One well) ন্যায়-বিচার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে দাভোলকার কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের প্রধান মুখ ওঠেন। “অখিল ভারতীয় অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি”-র সাথে যুক্ত হন। এরপর ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ভণ্ড সাধুরা ধর্ম ও মোক্ষলাভের নামে বুজরুকির মাধ্যমে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সাধারণ মানুষকে বোকা বানায়, প্রতারিত করে। এদের মুখোশ খুলতে, কুসংস্কার নির্মূল করে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে কাজ শুরু করে এই সংগঠন।

পঁচিশ বছরে মহারাষ্ট্র জুড়ে ২২৫ টি এইরকম কেন্দ্র চালু করেন দাভোলকর। প্রত্যেকটি অলৌকিক কাজের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তিনি ফাঁস করে দিতেন। এছাড়াও প্রান্তিক মানুষদের উদ্দেশ্যে 'পরিবর্তন' নামে এক সামাজিক কর্ম কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দাভোলকার দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি সাম্যের অধিকার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, ভারতের ধর্মীয় ব্যবস্থা ও ধর্মীয় দাঙ্গা প্রতিহত ইত্যাদির ব্যাপারে অতি সক্রিয় ছিলেন। তাঁর এসব কাজ ধর্মান্ধ, সুবিধেবাদী লোকেরা ভালো মনে নেয়নি। চারিদিকে প্রচুর শত্রু তৈরি হয়েছিল তাঁর।

এরপর তাতে ঘি দেয় ২০১০ সালে যখন কুসংস্কার বিরোধী ও ব্লাক ম্যাজিক বিলের খসড়া তৈরি করে 'মহারাষ্ট্র অন্ধ শ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'। ভারতীয় জনতা পার্টি ও শিবসেনা দল সরাসরি এর বিরোধিতা করে। কারণ হিসাবে তুলে ধরা হয় এটি হিন্দু সংস্কৃতি রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী। বিষয়টি নিয়ে দাভোলকার এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। বিষয়টি খুলে বলেন, ভুল ভেঙে দেন। এবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় কট্টরপন্থীদের। তাঁদের এতদিনের ব্যবসা সব চলবে কী করে! ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছিলেন তাঁরা।

এরপর এল সেইদিন। পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল যুক্তিবাদী নরেন্দ্র দাভেলকরকে। মূল অভিযুক্ত শরদ কলসকর ঘটনার ৬ বছর পর জানিয়েছিলেন, একটি হিন্দু কট্টরপন্থী সংগঠনের সদস্য বীরেন্দ্র তাউড়ে তাঁর মগজ ধোলাই করেন।

সংগঠনের আদর্শের পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি চলতে থাকে আগ্নেয়াস্ত্র চালানো, বোমা তৈরির প্রশিক্ষণও। এক দিন বলা হয়, কয়েক জন যুক্তিবাদীকে খুন করতে হবে। তার ওপর ভার পরে দাভেলকরকে সরিয়ে দেওয়ার। বলে দেওয়া হয়েছিল, মাথায় গুলি করতে যাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। সেই মত হয় কাজ। পরে পুলিশ গ্রেফতার করে বীরেন্দ্র তাউরেকে।

হারিয়ে গেলেন আরও একজন যুক্তিবাদী। সমাজের কাছে এই দিন কালো দিন নয়। নরেন্দ্র দাভেলকর দিয়ে গেলেন

এক শিক্ষা। নিজেদের কাছে শপথ নেওয়ার, যে কোনও মূল্যেই যুক্তিবাদ চালিয়ে যাওয়া। ভুল বা মিথ্যা কোনও কিছু যাতে কোনও মূল্যেই জিততে না পারে।

তাঁর জন্মদিন এই অগাস্টেই। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।

ও হে শিক্ষিত সমাজ

-সোমনাথ সেন

ও হে বঙ্গ "সমাজ" কাকে বলে?
সবই নাকি সমাজের দোষ।

আমাদের নিয়েই সমাজ গড়া, আর আমরাই নির্বোধ !
মোড়ে মোড়ে নেশার দ্রব্য কলো পট্টি পরা চোখে,
প্রকাশ্যে গিলছি আমরা একে-অপরের স্বচক্ষে;

ও হে বঙ্গ সমাজ
সব কিছুই লোক দেখানো সবার ভালো চাই,
ভেবে দেখেছো আমাদের ভবিষ্যতটা কোথায়?
দামী-দামী পোশাক গায়ে হাতে সবার বিজ্ঞান,
মেতেছে সবাই আধুনিকতায় বেড়েছে মানবিকতাহীন
জ্ঞান।
"মা-বাবাকে বাসবো ভালো" শিক্ষক দেন শিক্ষা;

আমাদের ভুল-ত্রুটি সব শুধরে গেল,
কিন্তু এই শিক্ষিত সমাজে মা-বাবা ই করেন ভিক্ষা?
সমাজ সমাজ বলি আমরা আমরাই সমাজের মুখ,

এই সুশিক্ষিত সমাজে সমালোচনায় মানুষের সুখ

অন্যের সফলতা দেখে বাড়ে নিজের দ্বেষ,
এই শিক্ষিত সমাজেই বেঁচে আছি বেশ ।।

মানবশক্তি

-প্রদীপ চক্রবর্তী

আমার ধর্ম মানবতা,
তোমার ও কি তাই?
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কাছে,
কিছুই মিলবে না; ভাই।

উঁচু জাত; নিচু জাত,
সাম্রাজ্যবাদের লম্বা হাত।
যুক্তিবাদের শক্ত দাঁত,
করবে যে আজ কিস্তিমাত।

ধর্ম স্থানে লাগলে আগুন,
নেভাতে আসে দমকল।
সর্বশক্তিমানের দেখা নেই,
মানবতাই সম্বল।

ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধান,
এতেই আছে সব নিদান।
চাষের জমি; খনির খাদান,
মনুষ্যত্বের গাও সবে গান।

স্যাটানিক ভার্সেস

- পৃথিবী

(মুক্তমনা বাংলা ব্লগ)

অনেকের মত আমি সালমান রুশদিকে শুধুই একজন "ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রী" হিসেবে চিনতাম। ইসলাম ধ্বংস করার জন্য যেই কথিত লৌকিক-পারলৌকিক শক্তিগুলা অহোরাত্রি খাটা-খাটুনি করে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে সালমান রুশদির নামটা অবধারিতভাবেই ঢুকে যায়। অন্তত মসজিদের ইমাম আর আশেপাশের মুরুব্বিদের মত "গণ্যমান্য" হিশেবে স্বীকৃত ব্যক্তিত্বদের বয়ান থেকে তাই শিখেছিলাম। যেই বইটা পুড়িয়ে ও যাকে কেন্দ্র করে ফতোয়াবাজি করে ইসলামিস্টরা গোটা বিশ্বের সামনে তাদের কদাকার চেহারা তুলে ধরেছিল, স্বভাবতঃই সেই বইটার প্রতি আমার কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। সাহিত্যের আনাড়ি পাঠক হওয়ার কারণে সব কনটেক্সট-সাবটেক্সট গলাধঃকরণ করতে পেরেছি বলে মনে হয় না, তবে অন্তত এটুকু বুঝেছি যে ইসলামিস্টরা বইটির সম্পূর্ণ ভুল চিত্র তুলে ধরেছে, বইটি নিয়ে ভীষণ নোংরা রাজনীতি হয়েছে। বইটি নিয়ে রুশদির "In Good Faith" প্রবন্ধটি অনুবাদ করার ইচ্ছা ছিল, তবে আমার অনুবাদপ্রচেষ্টায় লেখকের কণ্ঠ চাপা পড়ে যাচ্ছে দেখে শেষমেষ নিজের মত করেই প্রবন্ধটা লিখে ফেললাম।

The Satanic Verses বইটা আসলে কী, এই প্রশ্ন একেকজনের কাছে করলে একেকরকম উত্তর পাবেন। কেউ বলে ভ্রান্ত ইতিহাস, কেউ বলে ধর্মবিরোধী পুস্তিকা, কেউ মনে করে একটি পুঁজিবাদী-ইহুদি চক্রান্ত, কারও কারও কাছে এই বইটা হলোকস্টের চেয়ে কোন অংশে কম জেনোসাইডাল নয়। রুশদির কাছে এটি কেবলই একটি উপন্যাস, একজন লেখকের কল্পনার সৃষ্টি। উপন্যাসকে অবশ্য হেলাফেলা করার কিছু নেই। পাঠের যোগ্য উপন্যাস মাত্রই ভাষা, রুপ ও ভাবনাকে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে, ইংরেজি novel শব্দটি যেন জগতকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। রুশদি তাঁর সমগ্র লেখক জীবনে সাহিত্যের একটি ভাষা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সাহিত্যের এমন একটি রুপ যার মাধ্যমে প্রাক্তন উপনিবেশের বাসিন্দারা পূর্নরুপে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হবে। স্যাটানিক ভার্সেস যদি কিছু হয়ে থাকে, তবে সেটি হল একজন পরিযায়কের জগতদর্শন, রুশদির ভাষায় a migrant’s-eye view of the world। মূলোৎপাটন, বিচ্ছেদ, রুপান্তর- অভিপ্রয়াণের এই অভিজ্ঞতাকে সম্বল করেই রুশদি উপন্যাসটি লিখেছিলেন। সবাই হয়ত সশরীরে পাসপোর্ট হাতে বর্ডার পার হয় না, তবে ব্যক্তি জীবনে কোন না কোন বর্ডার কমবেশি সবাইকেই অতিক্রম করতে হয়। যৌবন অতিক্রমে করে মধ্যবয়সে পৌছুনোর বেদনাদায়ক যাত্রায় সবাইকেই অংশ নিতে হয়। অভিপ্রয়াণ

একটা খুবই লোভনীয় উপমা, যেকোন প্রসঙ্গে যেকোন ব্যক্তির উপর একে প্রয়োগ করা যায়।

উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলো ব্রিটিশ মুসলমান, তবে ধার্মিক মুসলমান না। প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীকে সঙ্করীকরণের বিরুদ্ধে লড়তে হয়, তারা পুরাতন ও নুতনের দ্বন্দ্বে ধরাশায়ী হয়। উপন্যাসটির কট্টর সমালোচকরা মনে করেন ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে মেলামেশা নিজের সংস্কৃতি ধ্বংসেরই নামান্তর। অন্যদিকে স্যাটানিক ভার্সেস সঙ্করতা, তথাকথিত আপজাত্য, সংমিশ্রণ, এবং এসব কিছু থেকে উদ্ভূত নতুন সংস্কৃতি, রাজনীতি, চেতনা, চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতকে উদযাপন করে। বইটা সঙ্করীকরণকে উপভোগ করে, পরমকে ভয় করে। এখান থেকে কিছু আর ওখান থেকে কিছু নিয়েই তো দুনিয়াতে নতুন কিছু একটা আসে। রুশদি গণঅভিপ্রয়াণের মাধ্যমে উত্থাপিত এই সম্ভাবনাকে আলিঙ্গন করেন। স্যাটানিক ভার্সেস সঙ্করীকরণের মাধ্যমে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে, বইটি সব সঙ্করদের প্রতি নিবেদিত একটি প্রেমগীতি। সব প্রশ্নের উত্তর জানার দাবিদার পরমের শিষ্যরা সঙ্কর জনসাধারণের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করেছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়, অস্বীকার করতে চেয়েছে এই সহজ সত্য যে প্রত্যেকটি মানুষ ইতিহাসের জারজ সন্তান। সাদা, কালো, বাদামি একজন আরেকজনের ভেতর প্রবিষ্ট হচ্ছে, যেভাবে নানা পদের মশলা মিশে সৃজন হয় নতুন কোন অমৃত। রুশদি মনে করেন- খাঁটি আর

ভেজালের এই প্রাচীন বিরোধ অব্যাহত থাকুক। মানুষ সবসময় নিজেকে এভাবেই বুঝেছে- কোন মানুষ, মূর্তি বা ভাবমূর্তির সামনে প্রণত হয়ে নয়।

রুশদি চেষ্টা করেছিলেন একটি প্রতিবাদী কর্ম সৃষ্টি করতে, যা পাঠকের পূর্বনির্মিত জগতচিত্রকে সংস্কার করবে। এই বইয়ে এমন কিছু নেই যার জন্য রাস্তায় নামতে হবে। মোল্লারা যেই বই নিয়ে বিলাপ করেছিল, ওই বইয়ের অস্তিত্ব নাই। এই বইটা নিয়ে যে ক্যাচাল হয়েছে, সেই ক্যাচালকে রুশদি প্রাচ্য আর পশ্চিমের স্বাধীনতার সংঘাত বলে মনে করেন না(যেমনটা অনেকে পরবর্তীতে দাবি করেছেন), কারন তার পরিযায়ী অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন যে পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষই স্বাধীনতার প্রতি সমানভাবে আসক্ত। নিজেকে স্বাধীন ধরে নিয়েই তিনি স্যাটানিক ভার্সেস লিখতে বসেছিলেন।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতাটা আসলে কী? এটা যাই হোক, আঘাত করার স্বাধীনতা না থাকলে এর কোন অস্তিত্বই নাই। সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় নৈষ্ঠিকতাকে ব্যঙ্গ করতে না পারলে আর্ট টিকবে না, আর্ট না টিকলে নিজেদেরকে “মানুষ” মনে করার একটা যুক্তি গায়েব হয়ে যাবে। স্যাটানিক ভার্সেসের একাংশ একজন ধর্মহীন ব্যক্তির সাথে ধর্মবিশ্বাসের মোলাকাতকে তুলে ধরে। বইটি সর্বাঙ্গে বিশ্বাসের প্রতি বৈরী নয়। এই বইয়েরই একটি ভারতীয় চরিত্র প্রশ্ন করছে, “আমরা যদি প্রথমেই কোন বিশ্বাসকে

ভুল ধরে লেখালেখি করি, তবে কি আমরা উন্নাসিকতার দোষে দুষ্ট নই? আমরা কি সাধারণের উপর নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী চাপিয়ে দিচ্ছি না?"। তবে উপন্যাসটিতে কিছু সংশয়ও আছে, উপন্যাসটি কিছু প্রশ্ন তুলে ধরে যা ধার্মিকদের পছন্দ হবে না। কিন্তু এই ব্যাপারটা খোদ ইসলামী সাহিত্যেই প্রাচীন আমল থেকে প্রচলিত আছে, স্যাটানিক ভার্সেস এদিক দিয়ে অভিনব না।

উপন্যাসটা কিসের প্রতিবাদ করছে? ধর্মবিশ্বাসের অধিকার তো নয়ই। এই গল্প সব ধরণের নৈষ্ঠিকতা ও পরম দাবির বিরোধী। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দরকার নাই, বিমান উড়িয়ে দেওয়া শিখ সন্ত্রাসেরও দরকার নাই, হাস্যকর খৃষ্টীয় সৃষ্টিবাদের দরকার নাই, ইসলামের সংকীর্ণ সংজ্ঞারও কোন দরকার নাই। এই প্রতিবাদ আর যাই হোক, খিস্তিখেউড় না। মুসলমানদের এসবে সমস্যা নেই, তাদের সমস্যা হল "রুশদি নবী মোহাম্মদকে সমকামী কইছে", "রুশদি বলছে যে নবীজি আল্লাহর কাছে ব্যভিচারের অনুমতি চাইছে", "রুশদি নবীজির স্ত্রীদেরকে বেশ্যা বলছে", "রুশদি কোরানকে শয়তানের কর্ম বলছে" প্রভৃতি দাবি। এই দাবিগুলার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর হল যে এই দাবিগুলো বারবার পুনরাবৃত্তির কারণে সত্যের মর্যাদা পেয়ে গিয়েছে, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বইটা না পড়েই বই আর বইয়ের লেখককে গালাগালি করেছে এবং করছে।

স্যাটানিক ভার্সেস দু'টি বিভাজিত সত্ত্বার গল্প। একটি সত্ত্বা হল সালাদিন চামচা, তার ক্ষেত্রে বিভাজনটা সেকুলার ও সামাজিক; সালাদিন বোম্বে ও লন্ডন, প্রাচ্য ও পশ্চিমের টানাপোড়েনের শিকার। অন্যদিকে জিব্রিল ফারিশতার ক্ষেত্রে বিভাজনটি আধ্যাত্মিক; বিশ্বাস হারিয়েও জিব্রিল বিশ্বাস করতে চায়, কিন্তু বিশ্বাস তাকে দেখা দেয় না। এই দু'টি বিভাজিত সত্ত্বার দ্বান্দ্বিকতা ও একাগ্রতা অর্জনের অভিযাত্রাই এই উপন্যাসের আধেয়।

কেন "জিব্রিল ফারিশতা"? "আসল" জিব্রিল ফেরেস্তাকে হেয় করার জন্যই কি এই নাম বেছে নেওয়া হয়েছে?

নাহ। উপন্যাসের জিব্রিল একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা। আর দশটা কুশীলব ও ফেরেস্তার মতই উপন্যাসের জিব্রিল আমপাবলিকের মাথার উপরে বসবাস করে, সে অর্ধেক দেবতা আর অর্ধেক মানুষ, সে জীবনের চেয়েও বড়। এই চরিত্রকে একজন ফেরেস্তার নাম দেওয়ার মানে হল তাকে ফেরেস্তাদের আধা-ঐশ্বরিকতার সেকুলার প্রতিমূর্তি প্রদান করা। তবে জিব্রিল যখন বিশ্বাস হারায়, এই নাম তখন তাকে তাড়া করে বেড়ায়।

এই গল্পে চামচা টিকে থাকে। সে প্রেম ও মরণের মত শাশ্বত সত্যকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়, সে পরিশেষে তার শেকড়ে ফিরে এসে একাগ্রতা অর্জন করে। জিব্রিল টিকতে পারে না। সে ইশ্বরের প্রতি ভালবাসা ফিরে পায় না, ইশ্বরপ্রেমকে সে ঐহিক প্রেম দিয়েও প্রতিস্থাপন করতে

পারে না, জিব্রিল নির্ধারিত সময়ের আগেই তার জীবনের উপসংহার লিখে ফেলতে বাধ্য হয়।

জিব্রিলের যাতনাগুলো তার কাছে স্বপ্নের রূপে আবির্ভুত হয়। এই স্বপ্নগুলোতে সে নিজেকে সত্যকারের জিব্রিল ফেরেস্তার রুপে আবিস্কার করে, বিভিন্ন ধর্মীয় ন্যারেটিভের সে প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয় এবং সেগুলোতে সে অনিচ্ছায় অংশগ্রহনও করে। এই স্বপ্নগুলো অবশ্য পুরোপুরি সংশয়ী মনোভাবের না। একটা স্বপ্নে সে নিজেকে মির্জা সাইদ আকবর নামক এক জমিদারের দেহে আবিস্কার করে। এই জমিদারের গ্রামে হঠাত একদিন একটি রহসময়ী বালিকা আবির্ভূত হয়, সে গ্রামবাসীকে তার সাথে পদব্রজে মক্কায় যাত্রা করার আহবান জানায়, তাদের জন্য আরব সাগর পথ ছেড়ে দাঁড়াবে। পুরো গ্রামবাসী মেয়েটির পেছনে যাত্রা শুরু করে, তাদের সাথে যোগ দেয় জমিদারের ধর্মপরায়ণ, প্রিয়তমা স্ত্রী। জমিদার এই কাফেলার পিছু নেন। তিনি এসব অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন না, নিজের চোখেই তিনি দেখেন তাঁর স্ত্রীসহ গোটা গ্রাম আরব সাগরে ডুবে যাচ্ছে। তবে বহুকাল পরে তিনি বিশ্বাস ফিরে পান। মরণের আগ মুহুর্তে ইশ্বর তাঁকে দেখান যে সেদিন আরব সাগর ঠিকই দু'ভাগ হয়েছিল, তার স্ত্রী ঠিকই সেদিন ইশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, সংশয়ের পর্দা ভেদ করে মির্জা সাইদ আকবর এই অলৌকিক পরিণতি অবলোকন করতে

পারেননি। জিব্রিলের সবগুলো স্বপ্নই বিশ্বাস ও সংশয়ের মধ্যকার অস্থিরতাটা তুলে ধরে।

জিব্রিলের যে স্বপ্নগুলো নিয়ে গোটা বিশ্বের মুসলিম সমাজে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, সেই স্বপ্নগুলো জিব্রিলের জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক ছিল। স্বপ্নগুলোতে জিব্রিল "জাহিলিয়া" নামক এক মায়াবী বালুকা নগরীতে "সাবমিশন" নামক এক ধর্মের উত্থান পর্যবেক্ষণ করে। স্যাটানিক ভার্সেস বইটা নিয়ে যাবতীয় কুৎসা ও আপত্তি এই স্বপ্নগুলোর অধ্যায় থেকেই নেওয়া হয়েছে।

এই স্বপ্নগুলো স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য ভয়াবহরকম বেদনাদায়ক ছিল। প্রতিটি রাতে এই স্বপ্নগুলো তাকে তার বিশ্বাসহীনতার জন্য শাস্তি দিত, বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার তার প্রাণান্ত প্রচেষ্টার মাঝে তার উপরে সংশয়ের গুরুবোঝা চাপিয়ে দিত। ঘুমের মধ্যে জিব্রিল প্রাণপণে চেষ্টা করত স্বপ্নগুলো হতে মুক্ত হওয়ার জন্য, কিন্তু স্বপ্নগুলো এক সময় সজাগ দুনিয়াতেও জিব্রিলকে গ্রাস করল, জিব্রিল বদ্ধোন্মাদ হয়ে গেল। মক্কা শরিফকে ভেংচি কাটার জন্য এই স্বপ্নের শহরকে "জাহিলিয়া" নাম দেওয়া হয়নি, বরং জিব্রিলকে ওই শহরে জোরপূর্বক পাঠিয়ে তার মানসিক অবস্থা বোঝানোর জন্যই এই নাম ব্যবহার করা। স্বপ্নের এই দৃশ্যগুলোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মানবজীবনের উপর ঈশ্বরহীনতার বিপর্যয়কর প্রভাবকে তুলে ধরা, ইসলামকে "ভুল" প্রমাণ করা নয়।

এই দৃষ্টিতে "আপত্তিকর" অধ্যায়গুলো দেখলে বাকি জিনিসগুলো নিজ থেকেই পরিস্কার হয়ে যায়। বইটির শিরোনাম "স্যাটানিক ভার্সেস" ইসলামের ইতিহাসের একটি বিতর্কিত অধ্যায়কে ইঙ্গিত করে। বলা হয়ে থাকে যে মোহাম্মদ মক্কার কুরাইশ গোত্রের নেতাদের সাথে একটা বোঝাপড়ায় এসেছিলেন যে মোহাম্মদ কুরাইশদের তিনটি নারী দেবতাকে স্বীকৃতি দিয়ে কোরানের আয়াত নাযিল করালে কুরাইশরা মোহাম্মদের আল্লাহর উপাসনা করবে এবং মুসলমানদের সাথে মক্কায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে। কিন্তু কুরাইশরা তাদের কথা রাখেনি, তাই মোহাম্মদ পরে শয়তান দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার দাবি করে ওই আয়াতগুলোকে কোরান থেকে বাতিল করে দেন, এর জন্য এর নাম "স্যাটানিক ভার্সেস"। জিব্রিলের সবচেয়ে পীড়াদায়ক স্বপ্নগুলার জন্য রুশদি এই ঘটনাকে বেছে নিয়েছেন কারন বিশ্বাস ও সংশয়ের দ্বন্দ্বের চরম পরিণতি লেখকের পক্ষে এই ঘটনাটার মাধ্যমেই সবচেয়ে ভালভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। জিব্রিলের স্বপ্নের এই দৃশ্যগুলোতে পাঠক মোহাম্মদের চরিত্রে "মাহুন্ড"(Mahound) নামক এক চরিত্রকে দেখতে পান, উল্লেখ্য যে সেই সময়কার খৃষ্টানরা অবমাননার উদ্দেশ্যে মোহাম্মদকে এই নামে অভিহিত করত। মাহুন্ডের কর্মকান্ডের প্রতি সংশয় প্রকাশ করে "সালমান দ্যা পারসিয়ান" নামক এক চরিত্র, যার দায়িত্ব ছিল মাহুন্ডের উপর নাযিলকৃত আয়াতগুলো নথিভুক্ত করা।

এই চরিত্রটি সাহাবী সালমান-আল ফারিসিকে হেয় করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, বরং উপন্যাসে রুশদির সরাসরি প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। রুশদি স্বীকার করছেন যে এই সালমানের মুখ দিয়ে বের হওয়া কথাগুলো অনেক পাঠকের কাছেই কর্কশ মনে হবে, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যেই জিব্রিলের স্বপ্নে এই দুর্মুখ ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছে, সেই জিব্রিল নিজেও একজন দুর্মুখ ব্যক্তি, মনযোগী পাঠক মাত্রই তা খেয়াল করবেন। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে যে জিব্রিল তার উন্মাদনার শেষ পর্যায়ে এই স্বপ্নগুলো দেখছে যখন তার জীবনের নিশ্চয়তাগুলো সব একে একে ভেঙে পড়েছে। এই স্বপ্নগুলো তার বাতুলতাকে পরিপূর্ণ করেছে।

তবে রুশদি স্বীকার করেন যে মক্কাবাসীর ওই তিন নারী দেবতাকে মাহুন্ড দ্বারা প্রত্যাখিত হওয়ার মাধ্যমে নারীর প্রতি ইসলামের মনোভাবকেও তিনি খোঁটা দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো কোরানে এখনও আছে,

‘Have ye seen Lat and ‘Uzza,

And another, the third (goddess), Manat?

What! for you the male sex, and for Him, the female?

Behold, such would be indeed a division most unfair!” [Qur’an 53:19-22]

সূরা আন-নাজম শুরু থেকে পড়লে প্রেক্ষাপটটা বুঝতে সুবিধা হবে।

আবার জিব্রিলের স্বপ্নের মধ্যেই সালমান দ্যা পারসিয়ান "সাবমিশন" ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন যে এই ধর্মটা মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি অংশের উপর নিজের আইন চাপিয়ে দিচ্ছে,

"At the oasis of Yathrib the followers of the new faith of Submission found themselves landless, and therefore poor. For many years they financed themselves by acts of brigandage, attacking the rich camel-trains on their way to and from Jahilia. Mahound had no time for scruples, Salman told Baal, no qualms about ends and means. The faithful lived by lawlessness, but in those years Mahound – or should one say the Archangel Gibreel? – should one say Al-Lah? – became obsessed by law. Amid the palm-trees of the oasis Gibreel appeared to the Prophet and found himself spouting rules, rules, rules, until the faithful could scarcely bear the prospect of any more revelation, Salman said, rules about every damn thing, if a man farts let him turn his face to the wind, a rule about which hand to use for the purpose of cleaning one's behind. It was as if no aspect of

human existence was to be left unregulated, free. The revelation – the recitation – told the faithful how much to eat, how deeply they should sleep, and which sexual positions had received divine sanction, so that they learned that sodomy and the missionary position were approved of by the archangel, whereas the forbidden postures included all those in which the female was on top. Gibreel further listed the permitted and forbidden subjects of conversation, and earmarked the parts of the body which could not be scratched no matter how unbearably they might itch. He vetoed the consumption of prawns, those bizarre other-worldly creatures which no member of the faithful had ever seen, and required animals to be killed slowly, by bleeding, so that by experiencing their deaths to the full they might arrive at an understanding of the meaning of their lives, for it is only at the moment of death that living creatures understand that life has been real, and not a sort of dream. And Gibreel the archangel specified the manner in which a man should be buried, and how his property should be divided, so that Salman the Persian got to wondering what manner of God this was that sounded so much like

a businessman. This was when he had the idea that destroyed his faith, because he recalled that of course Mahound himself had been a businessman, and a damned successful one at that, a person to whom organization and rules came naturally, so how excessively convenient it was that he should have come up with such a very businesslike archangel, who handed down the management decisions of this highly corporate, if non-corporeal, God”

সালমান এখানে কেবল জিব্রিলকে অত্যাচার করছে না, একই সাথে পাঠককেও খোঁচা দিচ্ছে। এটা একটা ভ্যালিড সমালোচনা, বিদ্বেষ না। কারও কাছে যদি মনে হয় উপরে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে, তবে তিনি “বিদ্বেষ” না ছড়িয়ে যৌক্তিক সমালোচনা করার একটা ছহিহ তরিকা বাতলে দিলে সংসারের সকল দুষ্টু লেখকদের সুবিধা হত। যারা এরুপ সমালোচনার জন্য রুশদিকে হত্যা করার পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন, তাদের প্রতি রুশদির প্রশ্ন- ধর্মের বিধান কেন সমালোচনার উর্ধ্বে থাকবে? সমালোচনাই যদি করতে না পারবে, তবে লেখক আর বুদ্ধিজীবিদের কাজটা কী?

তাছাড়া এমন তো না যে মুসলিম দুনিয়ায় ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে বিতর্ক হয় না। মুসলিম ধর্মপতিরা তাদের সুড়সুড়ি বন্ধ করার জন্য নারীদের উপর বোরকা-হিজাব

চাপিয়ে দিতে চাইলে অনেক মুসলিম নারী তার প্রতিবাদ করছে, ইসলাম নারীদের সন্তান পালনের উপর গুরত্ব আরোপ করলেও মুসলিম বিশ্বের নারীরা এখন স্বেচ্ছায় কর্মক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছে। মুসলিম সমাজ যেহেতু প্রতিদিনই নিজেদের বিধি-বিধান নিয়ে প্রশ্ন করছে, তাহলে ওই একই কাজ করার জন্য একজন ঔপন্যাসিকের কল্পা দাবি করতে হবে কেন?

যাই হোক, টেক্সটে ফেরা যাক। আরেকটা প্রচলিত অভিযোগ হল রুশদি নবীর সাহাবীদেরকে গালাগাল করেছেন। স্বপ্নের যেই দৃশ্যে নবীর সঙ্গীদের “scum” এবং “bums” বলা হচ্ছে, সেগুলো কাফিরদের মুখ নিঃসৃত, লেখকের নয়। জালিমের জুলুমকে বিশদে বর্ণনা না করে কি নিপীড়নকে ফুটিয়ে তোলা যায়? সংশয়ীদের প্রশ্নকে উত্থাপিত না করে কিভাবে আপনি আপনার উপন্যাসে সংশয়কে তুলে ধরবেন?

নবীর স্ত্রীদের নিয়ে করা অভিযোগটাও বিশেষভাবে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। জিব্রিলের স্বপ্নের শেষের দিকের দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে যে জাহিলিয়াতে সাবমিশন ধর্ম পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জাহিলিয়াবাসীর জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি অংশ ধর্মপুলিশের পর্যবেক্ষণে চলে আসে(এবং সাধারণ মানুষের মাঝে এক প্রকার অস্থিরতা সৃষ্টি হয়), একে একে প্রত্যেকটি ধর্মবিরোধী উপাদানকে নির্মূল করা হয়। রয়ে যায় শুধু একটি পতিতালয়। এমনিতেই উন্মুক্ত যৌনতায় অভ্যস্ত

জাহিলিয়াবাসীর উপর জেন্ডার সেগ্রেগেশন চাপিয়ে দেওয়ায় তাদের ভেতরে চাপা ক্ষোভ ছিল, তার উপর জাহিলিয়ার পুরুষদের দীর্ঘ দিনের প্রিয় এই প্রতিষ্ঠানকে উচ্ছেদ করলে তাদের অবদমিত অস্থিরতা বিস্ফোরিত হতে পারে, এই ভয়ে এই পতিতালয়কে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য জাহিলিয়াতে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই পতিতালয়ের পতিতারা পুরুষদের উত্তেজিত করার জন্য মাহুন্ডের স্ত্রীদের নাম নেয়, এবং এটাকে ভিত্তি করেই সমালোচকরা ছড়িয়ে দেয় যে রুশদি মোহাম্মদের স্ত্রীদেরকে বেশ্যা বলেছেন। অথচ উপন্যাসে পরিস্কার করেই বলা আছে যে মাহুন্ডের প্রকৃত স্ত্রীরা ঠিকই তাঁর হারেমে "শুদ্ধ" জীবনযাপন করছে, পতিতালয়ের পতিতারা তাঁদের নাম নিয়েছে শুধুই আগত পুরুষদের ফ্যান্টাসিকে তোষণ করার জন্য। এই প্রোভোকেটিভ চিত্রের মাধ্যমে দু'টো বিষয় তুলে ধরা হয়েছে- ১) শাসকদের বিলাসী জীবন নিয়ে শোষিতদের ফ্যান্টাসি ২) পবিত্র আর অপবিত্রতার দ্বন্দ্ব। হারেম আর পতিতালয়- এই দু'টো জায়গাতেই নারীদেরকে ব্যক্তিগত পুঁজি বা সম্পত্তির মত আলাদা করে রাখা হয়, পার্থক্যটা হল যে হারেমে মালিক থাকে স্থায়ীভাবে একজন আর পতিতালয়ে টাকার বিনিময়ে সাময়ীকভাবে প্রভুত্ব কিনে নেওয়া যায়। এই পতিতালয়ে বা'ল নামক এক কবি আশ্রয় নিয়েছিল, কুরাইশদের আমলে মাহুন্ডকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লেখার জন্য মাহুন্ড তার উপর ক্ষেপে ছিলেন। একদিকে

পতিতালয়ের মত অপবিত্র জায়গায় নবীর পবিত্র হারেমকে সিমুলেট করা, আরেকদিকে এই একই পতিতালয়ে নবীর সমালোচনাকারী এক অপবিত্র কবিকে আশ্রয় দেওয়া- পবিত্র আর অপবিত্রতার মধ্যকার অস্থিরতাটা তুলে ধরাই এখানে রুশদির উদ্দেশ্য। তবে শেষ পর্যন্ত্য পবিত্রতা অপবিত্রতাকে ধ্বংস করে, মাহুন্ড সবার সামনে পতিতা আর কবির মুন্ডু কর্তন করেন।

‘In the old days you mocked the Recitation,’ Mahound said in the hush. ‘Then, too, these people enjoyed your mockery. Now you return to dishonour my house, and it seems that once again you succeed in bringing the worst out of the people.’

Baal said, ‘I’ve finished. Do what you want.’

So he was sentenced to be beheaded, within the hour, and as soldiers manhandled him out of the tent towards the killing ground, he shouted over his shoulder: ‘Whores and writers, Mahound. We are the people you can’t forgive.’

Mahound replied, ‘Writers and whores. I see no difference here.’

পবিত্রতা আর অপবিত্রতার দ্বান্দ্বিকতা সালাদিন চামচা ও জিব্রিল ফারিশতার গল্পেও দেখা যায়। স্যাটানিক ভার্সেস

ক্যাচাল নিয়ে লেখা From Fatwa to Jihad বইয়ে লেখক কিনান মালিক বলছেন,

Angels and devils. Myths and monsters. These are at the heart of The Satanic Verses. The struggle of Saladin Chamcha and Gibreel Farishta, with themselves and with each other, is a struggle of the human imagination against the constraints placed upon it. One is a devil, the other an angel, yet they continually betray their own natures. When Saladin is arrested, Gibreel, the angel, refuses to help him. When the two meet up again in riot-torn east London, Gibreel appears as Azraeel, the most terrible of angels, wreaking fire and destruction. But even as he is hunted down by Gibreel, the demonic Saladin risks his life to save a family trapped in a burning house.

What Rushdie wants us to see is that the distinction between devil and angel lies less in their inner selves than in the roles that humans ascribe to them. If religion creates the divine and the Satanic in the image of man, secular society equally makes men in the image of devils and angels. Both religious faiths and secular societies deploy their angels and demons to justify their

otherwise unjustifiable actions, to create boundaries that cannot be transgressed.

পতিতালয়ের দৃশ্যটা মোটেই নবীর স্ত্রীদের হেয় করার জন্য নির্মাণ করা হয়নি, বরং নৈতিকতা ও যৌনতা সম্পর্কিত কিছু ভাবনাকে নাটকীয় রুপ দেওয়া হয়েছে। পতিতালয়টির নাম "হিজাব"- একটা আয়রনি, কারন এই অপবিত্র গৃহে পবিত্রতাকে সিমুলেট করা হয়। এখানে অবশ্য আমি আরেকটা আয়রনি দেখতে পাই যেটা রুশদি নিজের অজান্তেই তুলে ধরেছেন। মেয়েদের জামাকাপড় নিয়ে ঘুম হারাম করা, মেয়েদের "পবিত্রতা" নিশ্চিত করার গুরুভার বহন করা লোকগুলা নিঃসংকোচেই স্বীকার করে যে তাদের উপর তাদের মস্তিস্কের চেয়ে শিশ্নের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেশি, ক্ষেত্রবিশেষে শিশ্নই তাদের ঘিলু। জাকির নায়েক যখন দাবি করেন যে মেয়েরা "সংযত" জামা না পড়লে তারা "পাবলিক প্রপার্টি" হয়ে যাবে, তখন তিনি পবিত্রতার ঝান্ডাধারিদের অবচেতন ফেটিশগুলাকে নাঙ্গা করে দেন, তথাকথিত পবিত্রতার ধারণাটার মাঝে অপবিত্রতার প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত করেন- যেই ভাবটা এই গল্পে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। এরপরও আপনি আশ্বস্ত না হলে ফেসবুকের ওড়না পেজগুলো ঘুরে আসতে পারেন। যাই হোক, রুশদির উদ্দেশ্য ছিল যৌন সম্পর্কের মধ্যে পরিপৃক্ত ক্ষমতার লড়াইটাকে তুলে ধরা; এই পতিতালয়ে ক্ষমতাহীন পুরুষরা যেন রানীকে অধিকার করার পুলক লাভ করে।

এই পর্যন্ত্য পড়ার পর পাঠকের মনে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটা জাগে- এরকম উত্তেজক ইমেজারি ব্যবহার করার কী দরকার? "মাহুন্ড" নামটা যে মুসলমানদের খেপিয়ে দিবে এটা তো জানা কথা। আসলে এখানে টেক্সটকে প্রেক্ষাপটের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কারণে সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাসের ভেতরেই সরাসরি এই প্রেক্ষাপটকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বই না পড়েই চিল্লাচিল্লি করার কারণে প্রতিবাদকারীরা যেটা বুঝতে পারেনি,

To turn insults into strengths, whigs, tories, Blacks all chose to wear with pride the names they were given in scorn; likewise, our mountain-climbing, prophet-motivated solitary is to be the medieval babyfrightener, the Devil's synonym: Mahound

উপন্যাসটির একটি কেন্দ্রিয় থিম হল বর্ণবাদী ইংল্যান্ডে অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা। এই উপাখ্যানের একটি কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হল শত্রুর মুখ থেকে তার ভাষা কেড়ে নেওয়া, অপবাদকে শক্তিতে রুপান্তর করা। "মাহুন্ড" নামটা ব্যবহার করার পেছনে এটা একটা কারন- যারা একসময় মাহুন্ডকে পাগল বলে অপবাদ দিত এবং মাহুন্ডের ব্যর্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল, তারাই একসময় মাহুন্ডের পদতলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধার করার উপমাটিকে রুশদি অনেক দূর নিয়ে গিয়েছেন। লন্ডনে ল্যান্ড করার সাথে সাথেই সালাদিন চামচা আবিস্কার করে যে তার শিং গজিয়েছে, তার শরীর ক্রমশঃ জানোয়ারের মত হয়ে যাচ্ছে। ঘটনাক্রমে সে অভিবাসন পুলিশের হাতে মার খেয়ে নিজেকে হাসপাতালে আবিস্কার করে। পাশের বিছানাগুলোতে সে অনেকগুলো জানোয়ার দেখতে পায়, অকল্পনীয় সব দৈত্য-দানব। এরা কারা? এরা দাবি করছে যে এরা সব অভিবাসী, এলিয়েন। তদের আশ্রিত দেশ তাদেরকে যে রুপ দিয়েছে, তারা সেই রুপটাই ধারণ করে আছে।

They have the power of description, and we succumb to the pictures they construct.

অভিবাসীদেরকে শয়তান আখ্যা দিলেই তারা শয়তান হয়ে যায় না, আর শয়তান যদি আসলেই শয়তান না হয় তবে ফেরেস্তারাও নিশ্চয়ই আসলে ফেরেস্তা নন? এখান থেকেই রুশদি নৈতিকতার এক্সপ্লোরেশন শুরু করেন যেখানে নৈতিকতা পরম কিছু নয়, সদা পরিবর্তনশীল।

উপন্যাসের শিরোনামটাই পুনরুদ্ধারের দাবি চিৎকার করে জানান দিচ্ছে। "তোমরা আমাদের শয়তান মনে কর তো? ঠিক আছে, তোমাদের দুনিয়া সম্পর্কে শয়তানের ভাষ্যটা একটু শুনো"- একারণেই এই বইটি "স্যাটানিক ভার্সেস" বা "শয়তানের ভাষ্য"। যাদেরকে তাদের otherness এর কারণে তাদের আশ্রিত সমাজ দূরে ঠেলে দিয়েছে, এই বইটা

তাদেরই ভাষ্য। এই উপন্যাসের এশীয় শিশুরা সগর্বে শয়তানের শিং পরিধান করে ছুটোছুটি করে। তাদের উপর আরোপিত লেবেলটাকে তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছে। এই উপন্যাসে কোরানকে শয়তানের রচনা বলা হয়নি; যুক্তরাষ্ট্রে "ব্ল্যাক" শব্দটা যে প্রক্রিয়ায় বর্ণবাদী অপবাদ হতে সাংস্কৃতিক গৌরবের প্রকাশমাধ্যমে রুপান্তরিত হয়েছিল, এই বইটা সেই প্রক্রিয়ারই স্বাক্ষী।

বইটির মূল বক্তব্যকে এত জঘন্যভাবে বিকৃত করা হয়েছে যে রুশদি আক্ষেপ করে বলছেন যে তাঁর এই সাহিত্যকর্মটি হয়ত চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল। মৌলবাদী ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরাই যেন বইটির অর্থোদ্ধার করার ইজারা নিয়েছেন। সঙ্করীকরণ যেহেতু এই উপন্যাসটির নির্মাণের পেছনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা, তাই বলাই বাহুল্য যে ইসলাম ছাড়াও আরও অনেক উৎস থেকে উপাদান নেওয়া হয়েছে। প্রাক-খৃষ্টিয় যুগে ইশ্বর আর শয়তানকে একই সত্ত্বা বিশ্বাস করা হত,

It isn't until the Book of Chronicles, merely fourth century BC, that the word Satan is used to mean a being, and not only an attribute of God.

বইটির পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে যে দু'টো বই কাজ করেছে তার কোনটার সাথেই ইসলামের সম্পর্ক নেই- উইলিয়াম ব্লেইকের Marriage of Heaven and Hell এবং মিখাইল বুলগাকভের The Master and Margarita।

বুলগাকভকে সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে নিপীড়িত হতে হয়েছিল, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া সালমান রুশদিকেও একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছে। অনুপ্রেরণা হিসেবে আরও কাজ করেছে মহানগরীর প্রতি তাঁর অনুরাগ। একসময় বোম্বে এবং পরে লন্ডনে বসবাসের অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসে একটু হলেও ঢুকে পড়েছে,

The modern city is the locus classicus of incompatible realities. As long as they pass in the night, it's not so bad. But if they meet! It's uranium and plutonium, each makes the other decompose, boom.

আধুনিক যুগের একজন শহুরে পুরুষ হিসেবে রুশদির কাছে অনিশ্চয়তাই একমাত্র ধ্রুবক। তরুণ বয়সেই ইশ্বরকে হারালেও তাঁর কিছু আধ্যাত্মিক চাহিদা আছে, এই চাহিদাগুলো তিনি কোন আদি কারণের শরণাপন্ন না হয়েই তুষ্ট করতে আগ্রহী। সারা জীবন নির্ধার্মিক থাকার পরও যখন তাকে "মুরতাদ" ঘোষণা করা হয় তখন তিনি বিচলিত হন, যেই ভাষার সাথে তাঁর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই সেই ভাষায় তিনি বর্ণিত হতে চান না। তাঁকে যখন মুরতাদ আখ্যা দেওয়া হয়, তখন তাঁর জন্য যেন একটি মিথ্যা পরিচয় সৃষ্টি করা হয়; বস্তুকে পেছনে ঠেলে যেন ছায়াকে সামনে টেনে আনা হল। মিথ্যা পরিচয় তৈরীর প্রতিযোগীতায় তাঁর বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের জন্য তাঁর উপর ক্ষেপে থাকা

ব্রিটিশ মিডিয়াও কম যায় না, অনেক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব তাঁকে ইগোম্যানিয়াক, লোভী, ভন্ড হিসেবে অভিহিত করেছে। তারা এও প্রচার করেছে যে সালমান রুশদি তাঁর ওরিয়েন্টাল নামের জন্য লজ্জিত, তিনি Simon Rushton হিসেবে পরিচিত হতে ইচ্ছুক। আর যেহেতু সালমান রুশদি একজন "উন্মাদ", তাই তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করলে সেটি তার মিথ্যা প্রতিবিম্বকেই বৈধতা দিবে। তাঁর এই মিথ্যা প্রতিবিম্ব তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম সহিংসতাকে সহায়তা করেছে। মুসলমান বিশ্বে অনেক পত্রিকাতে তাঁকে পশ্চিমপ্রেমী, মেরুদন্ডহীন, লোভী ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে যে টাকার বস্তার বিপরীতে ইসলাম ধ্বংস করতে বসেছে। হর্হে লুইস বর্হেস, গ্রাহাম গ্রিনের মত লেখকরা লিখেছিলেন যে তাঁদেরই নাম নিয়ে তাঁদের একটি "other" পৃথিবীতে হেটে বেড়াচ্ছে। রুশদি আশংকা করেন যে তাঁর other হয়ত তাঁকেই নির্মূল করে দিবে।

১৯৮৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী আয়াতোল্লাহ খোমেনি রুশদির কল্লা চেয়ে ফতোয়া দেওয়ার কয়েক ঘন্টার মাথায় সাংসদ Keith Vaz রুশদিকে ফোন করে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর তিনি রুশদির মৃত্যু দাবি করা লোক সমাগমের সামনে বক্তৃতা প্রদান করে স্যাটানিক ভার্সেস নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। তার এক বছর আগে গার্ডিয়ানের কলামিস্ট হুগো ইয়াং ব্রিটিশ

মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে এক অমর বাণী ছেড়েছিলেন, “If not Dagenham, why not Tehran?”, মানে হল “এই দেশ ভাল না লাগলে ফুটো”। ওই একই লোক এক বছর পর মৌলবাদীদের সাথে গলা মিলিয়ে রুশদিকে দোষারোপ করেছিলেন। লর্ড Dacre ঘোষণা করেছিলেন যে রুশদিকে কেউ চিপায় নিয়ে পেটালে তাঁর কিচ্ছু যায় আসবে না। রানা কাব্বানি স্তালিনবাদী ঢংয়ে লিখেছিলেন যে সব লেখককে সমাজের কাছে “জবাবদিহি” করতে হবে। লেখক ব্রায়ান ক্লার্ক Who Killed Salman Rushdie? নামক একটি নাটক লিখে রুশদিকে পড়ার জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, রুশদির ভাগ্য ভাল সেই নাটক আলোর মুখ দেখেনি। টিভিতে লাইভ অনুষ্ঠানে দর্শকদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রুশদির বেঁচে থাকা উচিত কিনা, এমনকি এটা ন্যাশনাল ওপিনিওন পোল পর্যন্ত্য গড়িয়েছিল। খৃষ্টান পাদ্রীরাও ইসলামী মৌলবাদীদের পক্ষ নিয়ে বক্তব্য দিয়েছিল, এক John le Carre দাবি করেছিলেন যে রুশদি সবকিছু “জেনে শুনেই” এই কাজ করেছেন। রুশদি সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করেন- Osip Mandelstam স্তালিনকে নিয়ে কবিতা লেখার সময় কি জানতেন না যে তাঁকে এর জন্য খুন করা হবে? তাহলে কি তাঁকে খুন করা জায়েজ হয়ে গেল? শিক্ষার্থীরা তো সব জেনে শুনেই তিয়েনআমেন স্কোয়ারে প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল, তাদের খুন করা কি তাহলে হালাল হয়ে গেল?

রুশদি মনে করেন- বই তার লেখককে নির্বাচন করে, বই সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা পুরোপুরি সচেতন হয় না। তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্বাসের ক্ষমতা ও গ্রন্থ নাযিলের প্রকৃতি নিয়ে ধ্যান করতে চেয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অতি অবশ্যই একটি জেনুইন অভিজ্ঞতা। একজন পয়গম্বর যদি সত্যিই কোন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং পারলৌকিক জগত বলে যদি কিছু না থেকে থাকে, তবে আসলে ঘটছেটা কী? একজন অবিশ্বাসীর জন্য এটা একটা জটিল প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা মাথায় রেখেই তিনি মাহুন্ডের গল্পটি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি জানতেন স্যাটানিক ভার্সেসের ঘটনাটা বিতর্কিত, যে মোহাম্মদ নিজেকে একজন সাধারন বার্তা-বাহক দাবি করা সত্ত্বেও তাঁর জীবনচরিতের প্রতি মুসলমানদের সংবেদনশীলতা একটু বেশিই, কিন্তু তিনি ভাবতে পারেননি যে পাঠক জিব্রিলের স্বপ্নের দৃশ্যগুলোর কাঠামো থেকে লেখকের বক্তব্য উদ্ধার করতে ব্যর্থ হবেন। অবশ্য পাঠোদ্ধার করার জন্য তো আগে পাঠ করতে হবে, অনুভূতিতে আঘাত পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকা লোকজনের পাঠ করার ধৈর্য কই!

জাহিলিয়া একই সাথে মক্কা হয়, এবং মক্কা নয়। জাহিলিয়া নির্মাণের জন্য রুশদি কিছু ঐতিহাসিক দলিলের সাহায্য নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু একই সাথে এই শহরে একটি ভারতীয় নগরীর ছায়াও রয়েছে। জিব্রিল যখন লন্ডনে যায়, জাহিলিয়া তখন লন্ডনেরও কিছু অংশ শুষে নেয়। ফিকশন

ফ্যাক্ট থেকে যাত্রা শুরু করে, কিন্তু ফিকশন মাত্রই ফ্যাক্ট নয়।

রুশদি আসলে কী কী জানতেন? তিনি জানতেন যে মোহাম্মদ একজন রক্ত মাংসের মানুষ, আর দশটা রক্ত মাংসের মানুষের মত তাঁরও নারীপ্রীতি ছিল, মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি আরও জানতেন যে ইসলাম কোন মতেই সমসত্ত্ব নয়। ইসলামে যেমন কবি ইকবাল, খৈয়াম, ইমাম গাজ্জালির দার্শনিকতা আছে(গাজ্জালিকে অবশ্য ইকবাল, খৈয়ামদের কাতারে ফেলা ঠিক হবে না, আমার তাঁকে কট্টর বৈ কিছু মনে হয়নি), তেমনই ব্র্যাডফোর্ড মসজিদ কাউন্সিলের শাব্বির আখতার কিংবা ইরানপন্থী মুসলিম ইন্সটিটিউটের পরিচালক কলিম সিদ্দিকির সঙ্কীর্ণতাও আছে। জমিদার মির্জা সাইদ আকবর ও গ্রামবাসীর আরব সাগরে ডুব দেওয়ার মুল ঘটনাটাও তিনি জানতেন। এই বিশেষ গল্পটা লেখার সময় রুশদি চেষ্টা করেছিলেন ওই মানুষগুলোর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্বাসের ক্ষমতাকে অনুভব করতে, কেন কিছু মানুষ স্রেফ বিশ্বাসের জন্য নিঃচিন্তে আত্মহুতি দিতে পারে। রুশদি যদি তাঁর ভবিষ্যত দেখতে পেতেন, তবে কি তিনি উপন্যাসটির কাহিনী বদলে ফেলতেন?

না। Friedrich Durrenmatt তাঁর The Physicists গ্রন্থে লিখেছিলেন, What has once been thought cannot be unthought

স্যাটানিক ভার্সেসের ক্যাচালটাকে একটি রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখতে হবে, শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখলে হবে না। ভারতে মৌলবাদী সাংসদ সৈয়দ শাহাবুদ্দিন এই ক্যাচালকে পুঁজি করে রাজিব গান্ধীর পতনোন্মুখ সরকারকে এক হাত দেখে নিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ভোটারদের ক্ষমতা প্রদর্শন করা। কংগ্রেস সবসময়ই মুসলিম ভোটের উপর নির্ভরশীল ছিল। বইটি নিষিদ্ধ করার পরও কংগ্রেসের সেই যাত্রা রক্ষা হয়নি, শাহাবুদ্দিনদের একারণে বিশ্বাস করতে নেই। এই ক্যাচাল দক্ষিণ আফ্রিকার এপার্থিড বিরোধী ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের মুসলিম ও অমুসলিম সদস্যদের মাঝে বিভেদ গড়ে তুলেছিল। পাকিস্তানে নির্বাচনে মাইর খাওয়ার পর স্যাটানিক ভার্সেসকে আঁকড়ে ধরে ইসলামিস্টরা খেলায় ফিরে আসার পায়তারা করেছিল। বইটা পাকিস্তানে প্রকাশিত হবার আগেই নিষিদ্ধ করার পরও পাকিস্তানের জামায়াত ইসলাম আমেরিকান সংস্কৃতি কেন্দ্র ভাঙচুর করেছিল, রুশদির সাথে আমেরিকান সংস্কৃতি কেন্দ্রের সম্পর্ক কী সেটা তারাই বলতে পারবে। ওই মিছিলে পুলিশ গুলি ছুড়েছিল, হুদা কামে কম পক্ষে পাঁচজন মানুষ মারা গিয়েছিল। ইরানে খোমেনির ফতোয়া সদ্য সমাপ্ত ইরান-ইরাক যুদ্ধের লাখ লাখ ইরানী লাশের থেকে মনযোগ সড়িয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল। ব্রিটেনে অভিবাসীদের প্রতিনিধিত্বের অধিকারের জন্য

সেকুলার সংগঠনের সাথে ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিযোগীতায় ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার্সর্ এসোসিয়েশনের মত সেকুলার সংগঠন এগিয়ে ছিল, কিন্তু এই ক্যাচাল মসজিদগুলোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়। মসজিদগুলো একারণেই আন্দোলনের ইতি টানতে চায়নি, যদিও অনেক সাধারণ মুসলমানের কাছে প্রতিবাদের ধরণটা বিব্রতকর হয়ে পড়েছিল।

স্যাটানিক ভার্সেসের সাহিত্য মান নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, অনেক রিভিউতে দেখলাম বোদ্ধা পাঠকদের কাছেও বইটা দুর্বোধ্য লেগেছে। বক্তব্যের দিক দিয়ে বইটি দলিত অভিবাসী কমিউনিটির পক্ষে একটি শক্ত দলিল হতে পারত, কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্যাজুয়ালটি হয়ে বইটি ওই একই কমিউনিটির কাছে এখন স্রেফ একটি চপেটাঘাত ছাড়া কিছু না। মোল্লাদের মুঠোবন্দি পাঠকরা একটি সম্পূর্ণ নিরীহ ও হিতার্থী টেক্সটকে টুটি চেপে ধরে বধ করেছেন। একজন লেখকের জন্য তাঁর সৃষ্ট কর্মের এই পরিণতি বোধ করি মৃত্যু পরোয়ানার চেয়েও বড় শাস্তি।

" 'Respect for religion' has become a code phrase meaning 'fear of religion.' Religions, like all other ideas, deserve criticism, satire, and, yes, our fearless disrespect."

-Salman Rushdie

চেতনার অন্বেষণে

মাসে একটি লেখা

মুক্তচিন্তার ওপর লেখালেখি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে দেখে পত্রিকাটি শুরু করেছিলাম।

আপনারা যারা মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতার চর্চা করেন যেমন পারবেন, যতটুকু পারবেন লিখুন। ফেসবুক, ব্লগ ইত্যাদি মিডিয়ায় লেখা প্রকাশ করার পাশাপাশি লেখাটি পাঠান।

পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য যুক্তিবাদীদের লেখালেখিতে উৎসাহিত করা, এবং মুক্তচিন্তকদের চিন্তাধারা সমাজে তুলে ধরা।

প্রচলিত অর্থে ম্যাগাজিনের জন্য লেখা বলতে গুরুগম্ভীর, বড়, সাধারণ লেখার থেকে একটু আলাদা, কিংবা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এরকম বুঝি, কিন্তু আমরা যে ধরনের লেখা চাই তা এরকম হতেই হবে এমন মোটেও নয়। কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা কোন বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা কী সে সম্পর্কে ৫-১০ লাইন লিখলেও পাঠানো যায়। আমরা চাই আপনার লেখনী চলতে থাকুক। লেখায় নিজের পরিচয় গোপণ রাখতে চাইলেও অসুবিধা নেই, আপনার লেখা প্রকাশ করব। যা দুই বাংলার অগনিত মানুষের কাছে আমাদের ভাবনা ছড়িয়ে পড়বে এবং মুক্তচিন্তকদের আরও সংঘবদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে।

এমন নয় যে আপনার লেখাটি কোথাও প্রকাশ করেছেন বলে দেওয়া যাবে না, তা একেবারেই নয়। ক্রমশ অসহনীয় রাজনৈতিক দিনগুলিতে যুক্তিবাদীরা কোণঠাসা হচ্ছে। তাদের নিজেদের জন্য হলেও কলম তুলে নিতে হবে এটি নির্মম সত্য। কোন প্রকার প্রশ্ন এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা- yuktibadira@gmail.com

আগস্ট সংখ্যা সংগ্রহ করুন

পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হোন (বিনিময়মূল্য ছাড়াই)

পত্রিকার গ্রাহক হতে ফর্ম পূরণ করুন- Cilck Here | Scan QR

যো গা যো গ
✉ Email: yuktibadira@gmail.com

